হত্যা এবং তারপর

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
১০৭।এ, লেক রোড, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপ্রাণগোপাল সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রকাশালয়
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

এক টাকা।

ক্লাসিক প্রেস, ২১ পটুয়াটোলা-লেন,
কলিকাতা থেকে ছেপেছেন
শ্রীতেজেন্দ্র নাথ সরকার

উৎসর্গ

কুমারী মীরা নাগ,

নতুন গল্পের জন্যে তুমি আমাকে বড় তাগাদা দাও। তাই এই বইখানি উপহার দিলুম তোমাকেই।

দাদু

—কয়েকটা সাংঘাতিক বই—

১। **"রক্তাভ-বুদ্ধ"**—মণিলাল অধিকারী। ভ্যাম্পায়ার ও শোক-হরণের রক্তাভ-বুদ্ধ অভিযান ও সংঘর্ষ। বাঙলা ভাষায় এত চমৎকার রোম-হর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের বই খুব কমই আছে। সুন্দর ছবি, ঝরঝরে ছাপা। দাম এক টাকা চার আনা।

২। **"অদৃশ্য কালো হাত"**—নীহাররঞ্জন গুপ্ত। বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকের সেরা বই। পাতায় পাতায় শিহরণ। দাম আট আনা।

৩। **"দ্বীপান্তরের কয়েদী"**--অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী। দুর্দ্দান্ত বই। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। দাম আট আনা।

৪। **"বিদেহী আত্মা"**—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বাঙলা ভাষায় অনেক রোমাঞ্চকরী উপন্যাস লেখা হ'য়েছে; কিন্তু "বিদেহী আত্মা"র কাছে তা'রা কিছুই নয়। ছোটদের পক্ষে রাত্রে না পড়া-ই উচিত। বেরুলো ব'লে। দাম দেড় টাকা।

৫। **"মোহনপুরের শ্মশান"**—হেমেন্দ্রকুমার রায়। বিভীষিকার পর বিভীষিকা! পাকা লেখকের পাকা হাতের পাকা লেখা। শিগ্‌গিরই বেরুবে। দাম বার আনা।

৬। **"ব্ল্যাকমেল"**—অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী। রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা কর।

হত্যা এবং তারপর

প্রথম

পাঁচলক্ষ টাকা

তাদের সাধ ছিল গোটা পৃথিবীটার বুকের উপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি ক'রে আসে।

আমরা জয়ন্ত আর মাণিকের কথা বলছি। তারা বেরিয়েছিল পৃথিবী-ভ্রমণে। সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ বেড়িয়ে, গিয়েছিল তারা রহস্য-ভীষণ আফ্রিকায়। সেখানে বৎসর-খানেক কাটিয়ে তারা দক্ষিণ য়ুরোপের কয়েকটি দেশ দেখে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

চমৎকার লাগছিল। নানা দেশ, নানা ভাষা, নানা আচার-ব্যবহার! কখনো অকূল নীলসাগরের তরঙ্গ-দোলায়, কখনো বিজন গহন বনের ভিতরে চির-সন্ধ্যা-অন্ধকারে, কখনো রৌদ্রতপ্ত রুদ্র মরু-জগতের নির্জ্জল ও নিস্তব্ধ হাহাকারের মধ্যে, কখনো তুষার-ঝটিকায় বিচিত্র বরফে-মোড়া তুঙ্গ গিরি-শিখরে মেঘরাজ্যের কাছে; কখনো জাভার বড়-বুদ্ধের মন্দির-চাতালে, কখনো মিশরের পিরামিডের

চূড়ায়, কখনো গ্রীসের পার্থেননের প্রাচীন মর্ম্মর-স্বপ্নের সামনে এবং কখনো বা চিরন্তন নগর রোমের অতীত কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের ভিতরে!

কতবার নাগরিক সভ্যতার সদর-মহল ছেড়ে তারা প্রবেশ করেছে অজ্ঞাত অসভ্যতার অন্তঃপুরে! যেখানে বোর্ণিয়ো-সুমাত্রার স্তব্ধ অরণ্যে প্রভুর মত বৃক্ষ-রাজ্যে বাস করে ওরাং-ওটানরা; যেখানে আফ্রিকার বন-প্রান্তরে জেব্রা ও জিরাফের পিছনে পিছনে মৃত্যু-বিদ্যুতের মতন ছুটে যায় লাঙ্গুল তুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে সিংহের দল; যেখানে জলে ভাসে কুমীর ও হিপো এবং স্থলে বেবুন ও উটপাখীদের রঙ্গভূমির চারিপাশে ভূমিকম্প জাগে হাতী ও গণ্ডারদের পায়ের তালে; যেখানে গাছের ডালে-খোলে অজগর এবং পাহাড়ের নীচে-উপরে শোনা যায় গরিলার গর্জ্জন!

ছবির পর ছবি বদ্‌লে যায়—দৃশ্যের পর দৃশ্য—ধ্বনির পর ধ্বনি! এ-সবের কাছে কোথায় লাগে সিনেমার সবাক চিত্র! জয়ন্ত ও মাণিকের বার বার মনে হয়েছে, এতদিন পরে ধন্য তাদের জীবন, সার্থক তাদের জন্ম, সফল তাদের বাসনা!

কিন্তু এ-যাত্রায় তাদের পৃথিবী-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হ'ল না। ইংলণ্ডে পা দিয়েই তারা শুনলে, য়ুরোপের দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ-দামামার ধ্বনি! এবং তারপর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বিলাতের সারা আকাশ ছেয়ে দেখা দিলে পঙ্গপালের

মত জার্ম্মানির উড়োজাহাজরা। জল-স্থল-শূন্য—সর্ব্বত্রই মৃত্যুর হুঙ্কার ও মানুষের আর্ত্তনাদ !

জয়ন্ত ও মাণিক বুদ্ধিমান। সব পথ বন্ধ হবার আগেই তারা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এল আবার স্বদেশে।

দুই বৎসর পর দেশে এসে তারা দুই দিন বিশ্রাম করলে। তৃতীয় দিনে দুই বন্ধু বেড়াতে বেরুলো।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, দু-বছর পরে এখানে এসে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কলকাতার উপরেও আছে খানিকটা নূতনত্বের পালিস !"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু এ পালিসের চক্‌চকানি দীর্ঘস্থায়ী নয়।"

জয়ন্ত বললে, "কোন নূতনত্বই দীর্ঘস্থায়ী নয়—ব'লেই তো নতুনের এত আদর।"

মাণিক বললে, "পুরাতনেরও আদর কি কম ? মানুষ তো একটানা নূতনত্বের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসে না ! তারই ভিতরে থেকে থেকে সে ফিরে চায় আবার অতি-পরিচিত বন্ধুর মত পুরাতনকে !"

—"ঠিক বলেছ। পুরাতনের পর নূতন, আবার নূতনের পর পুরাতন। মানুষ এ-দুটির কোনটিকেই ত্যাগ করতে পারে না। তাই তো হঠাৎ সুন্দরবাবুর পুরাতন মুখ দেখে আমার মনে জাগছে খুসির ইঙ্গিত !"

—"সুন্দরবাবু ? কোথায় ?"

—"ঐ যে!"

মাণিক ফিরে দেখলে, ওধারে ফুটপাথের উপর দিয়ে জন-পাঁচেক পুলিসের লোকের সঙ্গে হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবাবুর বিপুল বপু।

এইবারে সুন্দরবাবুও তাদের দেখতে পেয়ে চম্‌কে ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে সবিস্ময়ে বেরিয়ে পড়ল সেই বিখ্যাত শব্দটি—"হুম্!"

সুন্দরবাবুকে যারা চেনে তারা জানে যে, অতিরিক্ত ক্রোধে বা বিস্ময়ে বা দুঃখে বা আনন্দে তিনি এক-একরকম সুরে "হুম্" শব্দটি উচ্চারণ ক'রে ভাবাভিব্যক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দেন। তাঁকে যারা চেনে না তারা জানতেই পারবে না যে, একটিমাত্র 'হুম্' শব্দ কতরকম ভাব প্রকাশ করতে পারে!

সুন্দরবাবু ও-ফুটপাথ্ থেকে ছুটে আসবার উপক্রম করছেন দেখে, জয়ন্ত ও মাণিক তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

—"আরে জয়ন্ত, আরে মাণিক,—হুম্! সাত সাগর লঙ্ঘন ক'রে আবার তোমরা কলকাতায় এসেছ কবে হে?"

—"পরশু।"

—"তোমরা তো ব'লে গিয়েছিলে পাঁচ-ছয় বছরের আগে কলকাতায় ফিরবে না!"

—"তাই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু হিট্‌লার যে আমাদের তাড়িয়ে দিলে! নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধে মরতে রাজি আছি,

কিন্তু বিদেশ-বিভূঁয়ে জার্ম্মান বোমা খেয়ে হাত-পা খোঁড়া ক'রে বেঁচে ম'রে থাকতে চায় কে ?"

হ্যাচ্চো শব্দে হেঁচে ফেলে সুন্দরবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই ! এই ছ্যাখো হাঁচি পড়ল !……তারপর ? কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়ে এলে ?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "এক নিঃশ্বাসে কি সাতকাণ্ড রামায়ণের কথা বলা যায় ? বরং সন্ধ্যের মুখে আমার বাড়ীতে যাবেন। নিমন্ত্রণ রইল।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আ আমার পোড়াকপাল, আমার আবার নিমন্ত্রণ ! আমি যে ঢেঁকি, ধান ভান্তেই জন্মেছি, স্বর্গে গেলেও ধান ভান্‌তে হবে !"

—"ব্যাপার কি, নতুন কোন শক্ত 'কেস' হাতে পেয়েছেন নাকি ?"

—"কেস্‌টা খুব শক্ত ব'লে বোধ হচ্ছে না, তবে আগেকার চেয়ে একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে বটে ! শুনবে ? আচ্ছা চলতে চলতে বলি শোনো।"

সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হ'তে জয়ন্ত এই কথাগুলি শ্রবণ করলে :

—"রামচন্দ্র বসুর বাড়ী হচ্ছে দশ নম্বর ধরণী সেন ষ্ট্রীটে। তিনতালা বাড়ী—রামবাবুর নিজের বাড়ী। তিনি অবিবাহিত, বয়স পঞ্চাশের ওপারে। ধনী। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আছে এক ভাইপো, সে দেশে থেকে জমিদারি তদ্বির করে।

"রামবাবু বাড়ীর তেতালায় একলা থাকতেন। বাড়ীর দোতালার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছে ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস নামে একটি লোক। সেও একলা মাস-তিনেক হ'ল কলকাতায় নতুন এসেছে।

"একতালায় দুটি গরীব বাঙালী পরিবার বাস করে। তারা পুরাণো ভাড়াটে।

"আজ দুদিন আগে রামবাবুর শয়নগৃহে রামবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। লাস দেখলেই বোঝা যায়, বিষপানের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থির করলুম, আত্মহত্যা।

"কিন্তু তদন্তের ফলে আত্মহত্যার কোনই কারণ পাওয়া গেল না। রামবাবুর অর্থের অভাব বা অন্য কোনরকম দুঃখ-দুর্ভাবনাও ছিল না। মৃত্যুর দিন তিনি থিয়েটার দেখে রাত সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসেন।

"কেউ যে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, এমন প্রমাণও পেলুম না। প্রথমত, সকলেরই মুখে শুনলুম তিনি অজাতশত্রু, সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘর থেকে কিছুই চুরি যায় নি। লোহার সিন্ধুকের চাবি তাঁর পকেটেই ছিল। সিন্ধুকের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে ছয় শত টাকার নোট আর কিছু সোনার গহনা। চুরি করবে ব'লে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে বিষ খাওয়ায় নি। চোর কখনো এতগুলো টাকা আর গহনা ফেলে যেত না!

"লাস্ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়েছিলুম। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ, রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখ্‌রো সাপের বিষে। অথচ তাঁর গায়ের কোথাও সর্পদংশনের দাগ নেই! তাঁর ডান পায়ে তিনটে ছোট ছোট টাট্‌কা ক্ষতচিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে সেগুলো হচ্ছে বিড়ালের মত কোন ছোট জানোয়ারের নখ দিয়ে আঁচড়ানোর দাগ!

"দেখ তো ভাই জয়ন্ত, এ আবার কি ফঁ্যাসাদ! সর্পদংশনের দাগ নেই, অথচ রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখ্‌রো সাপের কামড়ে! আর কলকাতা সহরে পাকা বাড়ীর তেতালায় গোখ্‌রো সাপ! অপরংবা কিং ভবিষ্যতি! তাই চলেছি আবার তদন্তে।

"হুম্! এই যে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি! এই-খানে রামবাবুর বাড়ী। জয়ন্ত, মাণিক, তোমাদেরও তো চড়্‌কে পিঠ, যদি আগ্রহ থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারো।"

দেশে ফিরেই আবার এ-রকম অপ্রীতিকর মাম্‌লা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে জয়ন্ত ও মাণিকের কোনই আগ্রহ হ'ল না। তারা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে রামবাবুর বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবক। তার মাথার চুল এলোমেলো, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই গালে অশ্রুর চিহ্ন—সারা মুখখানি যেন বিষাদে আচ্ছন্ন।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, "তুমি আবার কে বাপু?"

—"আমি রামবাবুর ভাইপো।"

—"নাম কি?"

—"অজিতকুমার বসু।" তারপর একটু থেমেই সে বললে, "শুনছি, কাকাবাবুর লোহার সিন্ধুকে নাকি মোটে ছ'শো টাকা পাওয়া গিয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

অজিত পকেট থেকে একখানা পত্র বার ক'রে বললে, "কাকাবাবু যে রাত্রে মারা যান সেইদিনই এই চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলেন। আর এই চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় এসেছি।"

চিঠিখানা পড়তে পড়তে সুন্দরবাবু বার বার "হুম্" শব্দ উচ্চারণ করছেন শুনে জয়ন্তও কৌতূহলী হয়ে তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

চিঠিখানা এই :

"স্নেহের অজিত,

যুদ্ধ বেধেছে ব'লে অনেকেই ভয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। বন্ধুদের পরামর্শে আমাকেও তাই করতে হ'ল। আমার সমস্ত টাকা—অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ আমি আজ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি। পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট আমার ঘরের লোহার সিন্ধুকে বেশী দিন রাখা নিরাপদ হবে না। এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই—কারণ তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। অতএব পত্র পেয়েই কলকাতায় চ'লে এস। ইতি; তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরামচন্দ্র বসু"

চিঠি-পড়া শেষ ক'রে সুন্দরবাবু আবার বললেন, "হুম্।'

জয়ন্ত বললে, "অজিতবাবু, আপনার বিশ্বাস ঐ লোহার সিন্ধুকেই রামবাবু পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট রেখেছিলেন?"

—"কাকাবাবুর একটিমাত্র লোহার সিন্ধুকই আছে।"

"সুন্দরবাবু, আপনি কি বলেন?"

—"এ আবার কি হ'ল ভাই জয়ন্ত! ভেবেছিলুম মামলাটা খুব হাল্কা, কিনারা করতে দেরি লাগবে না! কিন্তু কেঁচো খুঁজতে খুঁজতে ক্রমেই যে সাপের পর সাপ বেরুচ্ছে!"

মাণিক বললে, "যে সে সাপ নয় সুন্দরবাবু, একেবারে জাত-গোখরো!"

"হুম্, বিষম রহস্য! সাপে কামড়ায় নি, অথচ সাপের বিষে মৃত্যু! লোহার সিন্ধুক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অদৃশ্য! মানে, এ মামলাটা হচ্ছে খুনের মামলা!"

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, "লাসের পায়ে বিড়ালের মতন ছোট জানোয়ার নখ দিয়ে আঁচড়েছে! এরই বা মানে কি?"

———

দ্বিতীয়

কুকুর ও বিড়াল

রামবাবুর শয়নগৃহে ঢুকে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তারপর বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি কি এ মামলায় আমার সাহায্য চান?"

সুন্দরবাবু বললেন, "সে কথা আর বলতে! আমার মাথার সঙ্গে তোমার মাথা মিললে আমরা দুজনে দিগ্বিজয় করতে পারি।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "আপাতত বোধ হয় দিগ্বিজয় করবার দরকার হবে না। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি যখন প্রথম এ ঘরে ঢোকেন, তখন জানলাগুলো কি খোলা ছিল?"

—"না, একটা জানলাও খোলা ছিল না। দরজাটাও ছিল ভিতর থেকে বন্ধ।"

—"তা'হলে সাপটা ঘরের ভিতরে ঢুকল কেমন ক'রে?"

মাণিক বললে, "হয়তো ঘরের কোন কোন জানলা খোলা ছিল, রামবাবু ঘরে ঢুকে নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।"

—"তাহ'লে গোখ্‌রো সাপটা পালালো কোন্ পথ দিয়ে?"

—"হয়তো ঐ নর্দ্দমা দিয়ে ঢুকে সে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।"

—"মাণিক, তোমার এ অনুমানটাও সত্য হ'তে পারে। কিন্তু রামবাবুর দেহের কোথাও সর্পদংশনের চিহ্ন নেই কেন? গোখ্‌রো সাপের বিষ পান করলেও কারুর মৃত্যু হয় না, জানো তো? ও বিষ রক্তের সঙ্গে না মিশলে মারাত্মক হয় না।"

মাণিক হতভম্বের মতন মাথা চুল্‌কোতে সুরু করলে।

একতালায় যারা ভাড়া থাকত তারা তখন উপরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের একজনকে ডেকে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "ঘটনার দিন রামবাবু সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়ীতে ফিরেছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"সেদিন এখানে কোন সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছিল?"

—"আজ্ঞে না।"

—"কোন শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন?"

—"আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ব'লে এখন একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। সে-রাত্রে রামবাবু হঠাৎ এত জোরে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন যে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেছিলুম।"

—"অত জোরে তিনি কখনো দরজা বন্ধ করেন না?"

—"না। তিনি অত্যন্ত ধীর স্থির মানুষ।"

—"বেশ। এটা একটা ভালো সূত্র ব'লে মনে হচ্ছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার মতে এটা উল্লেখযোগ্য সূত্রই নয়।"

জয়ন্ত বললে, “কেন নয় ?”

—“এর দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে ?”

—“প্রমাণিত হচ্ছে যে, হঠাৎ কোন কারণে ভয় পেয়ে রামবাবু তাড়াতাড়ি সজোরে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।”

—“হুম্। হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে।”

জয়ন্ত আবার লোকটির দিকে ফিরে বললে, “রামবাবুর পায়ে বিড়ালের আঁচড়ানোর দাগ পাওয়া গিয়েছে। তিনি কি বিড়াল পুষতেন ?”

—“না মশাই। বিড়ালকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।”

—“এ বাড়ীতে আর কেউ বিড়াল পোষে ?”

—“কেউ না। তবে একটা বিষম খেঁকী হুলো বিড়াল খাবারের লোভে প্রায়ই এখানে হানা দেয় বটে।” লোকটি একবার থেমে আবার বললে, “ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলাতে দোতালায় সেই বিড়ালটার আর্ত্তনাদও শুনেছিলুম।”

—“দোতালায় থাকেন ভৈরববাবু ?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“বিড়ালটা আর্ত্তনাদ করছিল কেন ?”

—“তা আমি জানি না।”

—“রামবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন ?”

“না।”

“ভৈরববাবু ?”

-“তিনিও সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন।”

—"তারপর ফিরে এসেছিলেন তো ?"

—"হ্যাঁ, প্রায় শেষ-রাতে।"

—"শেষ-রাতে! কেন ?"

—"কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল।"

—"আচ্ছা, এইবারে ভালো ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি, সে-রাত্রে আর কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা ?"

—"আপনাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছে না।"

—"তবু ভেবে দেখুন। যে কোন ঘটনা আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

—"কিন্তু এ অতি বাজে ঘটনা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন দুটোর কম হবে না। ঘুম ভাঙতেই শুনি, বাড়ীর পাশের খানার ভিতর থেকে একটা বিড়াল আর একটা কুকুরের তুমুল ঝগড়ার শব্দ আসছে। খানিক পরেই সব চুপচাপ।"

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, "আপনার আর কিছু মনে পড়ে ?"

—"আজ্ঞে না।"

উপস্থিত আরো তিনজন লোকের মুখ থেকে নূতন কোন তথ্যই জানা গেল না।

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল আর একটি নূতন মানুষ।

তার বয়স হবে বছর পঁইত্রিশ। শ্যামবর্ণ। দাড়ী-গোঁফ কামানো। দোহারা দীর্ঘ চেহারা—দেখলেই তাকে বেশ বলিষ্ঠ ব'লে মনে হয়। জামা-কাপড়ে সৌখীনতার চিহ্ন। লোকটির মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার হাসিখুসি-মাখা প্রশান্ত মুখ এবং অতি-বিনীত অমায়িক-ভাবভঙ্গি।

সেখানে এসেই লোকটি বললে, "আমার নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আপনার চেহারায় ভৈরবত্ব কিছুই নেই। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল সুশান্ত।"

ভৈরব চোখে-মুখে হাসির উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বললে, "ও-রকম কথা আরো কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এখন আর পিতার ভ্রম সংশোধন করবার উপায় নেই।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ীর দোতালায় আপনি থাকেন?"

ভৈরব যুক্তহস্তে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"শুনছি কলকাতায় আপনি নতুন এসেছেন?"

"আজ্ঞে, ঠিক নতুন নই, মাস-তিনেক এসেছি। ছেলে-বেলাতেও কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।"

—"আপনি কি করেন!"

—"আজ্ঞে স্তর, এইবারেই আপনি আমাকে বিপদে ফেললেন। কারণ, আমি কিছুই করি না।"

—"কিছুই করেন না!"

—"কিছু না স্যর, কিছু না। খালি ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে। কখনো ভারতের ভিতরে, কখনো ভারতের বাইরে। এক দেশে বেশীদিন থাকলেই আমার অসুখ হয়। কলকাতাতেও আর আমার মন টিকছে না। স্থির করেছি, শীঘ্রই পিঠটান দেব।"

সুন্দরবাবু বললেন,"হুম্! খাসা আছেন দেখছি! আমিও তো মাঝে মাঝে মনে করি, দুনিয়ার দিকে দিকে পথে পথে ছোটাই আমার পদযুগলকে কিন্তু পারি না কেবল পাথেয়ের অভাবে।"

—"পাথেয় স্যর? ঐখানেই ভগবান আমাকে দয়া করেছেন। বাবা পরলোকে, কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ লোহার সিন্ধুকের চাবিটি রেখে গিয়েছেন ইহলোকেই। আমার ভাই-বোন কেউ নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "মশাই, আপনার সৌভাগ্যে আমার হিংসা হচ্ছে।"

বিনয়ে ভেঙে প'ড়ে ভৈরব হাসতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "ভৈরববাবু, ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলায় আপনার দোতালায় একটা বিড়াল আর্তনাদ করেছিল কেন?"

ভৈরব হাসতে-হাসতেই বললে, "বড়ই চোট্টা বিড়াল স্যর, বড়ই চোট্টা বিড়াল! রোজ চুপিচুপি আমার খাবার খেয়ে চম্পট দেয়। তাই সেদিন তাকে ধরতে পেরে আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলুম।"

সুন্দরবাবু ব'ললেন, "বেশ করেছিলেন মশাই, আমার বাসাতেও ঐ-রকম একটা মহা-চোর ধুম্বো বিড়াল আসে। আজ পর্য্যন্ত কত বড় বড় চোর ধরলুম, কিন্তু সে বেটাকে কিছুতেই আর গ্রেপ্তার করতে পারলুম না!"

জয়ন্ত বললে, "সন্ধ্যের পর আপনি কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন?"

ভৈরব বললে, "হ্যাঁ স্যর, এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে ছিল। ফিরেছি রাত সাড়ে তিনটেয়।"

—"অত রাত হ'ল কেন?"

—"বন্ধুর বাড়ী আগড়পাড়ায়। কাজকর্ম্ম চুকতেই রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তারপর ট্যাক্সি চ'ড়ে এসেছি কলকাতায়।"

—"এখানে এসে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন?"

—"কিছু না স্যর, কিছু না! সব চুপচাপ। কোথাও একটি টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত ছিল না!"

—"আচ্ছা, আপাতত আমার আর কিছু জানবার নেই। সুন্দরবাবু, এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।"

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, "হুম। প্রশ্ন করব না ছাই করব! এতক্ষণ প্রশ্ন ক'রে তুমি কি জানতে পারলে? জানা গেল খালি তো এই: একটা বিড়াল একজন মানুষকে আঁচড়ে দিয়েছে। একটা চোর-বিড়াল ধরা প'ড়ে চোরের মার খেয়েছে। এ-সব জেনে আমাদের লাভ? খুনের মামলার সঙ্গে বিড়ালের ইতিহাসের সম্পর্ক কি?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "যা বলেছেন! এ মামলায় বিড়ালের উপদ্রব বড় বেশী। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!"

—"সন্দেহ? কিসের সন্দেহ?"

—"সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো একটা বিড়াল এসেই শেষটা আমাদের আসল পথ বাৎলে দেবে!"

—"পথ বাৎলে দেবে? কেমন ক'রে? ম্যাও ম্যাও রবে চেঁচিয়ে?"

হা হা ক'রে হেসে উঠে ভৈরব বললে, "স্যর, আপনি বেশ মজার কথা বলেন!"

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "মশাই, মজার কথায় আসামী গ্রেপ্তার হয় না! চল জয়ন্ত, থানায় যাই। কী যে ছাই রিপোর্ট লিখব, তাই এখন ভাবছি!"

মাণিক বললে, "কিছু ভাববেন না সুন্দরবাবু, কিছু ভাববেন না! রিপোর্টে লিখুন, তিন বিড়ালের কাহিনী!"

—"যাও যাও মাণিক, বাজে বোকো না—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না!"

সকলে নেমে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "এইটেই বুঝি থানা?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

—"এর ভিতর থেকেই বিড়াল-কুকুরের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

খানাটা হাত-আড়াই চওড়া। লম্বায় অনেকখানি। অন্য প্রান্তটা আধা-অন্ধকারে অস্পষ্ট। তলদেশে আধহাত চওড়া একটি খোলা ড্রেন। এখানে-ওখানে দুর্গন্ধময় জঞ্জাল ছড়ানো।

জয়ন্ত খানার ভিতরে প্রবেশ করলে বিনাবাক্যব্যয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, ও কি হে ?"

জয়ন্ত অগ্রসর হ'তে হ'তে বললে, "খানার ভিতরটা একবার বেড়িয়ে আসি।"

—"ঐ মেথরের পথ কি বেড়াবার ঠাঁই ?"

জয়ন্ত জবাব দিলে না।

ভৈরব বললে, "স্যর, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার বন্ধুটির হাব-ভাব যেন কেমন কেমন !"

—"হ্যাঁ, জয়ন্তের মাথায় একটু ছিট আছে। নইলে ওর আর সব ভালো।"

—"খানার ভিতরে গিয়ে উনি কি দেখতে চান ?"

—"ভগবান জানেন।"

মিনিট-কয় পরে জয়ন্ত একটা মৃত বিড়ালকে ও একটা মৃত কুকুরকে লাঙ্গুল ধ'রে টানতে টানতে খানার বাইরে নিয়ে এল।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন, বিপুল বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না।

মাণিক বললে, "জয়, আজ কি তুমি ধাঙড়ের কর্ত্তব্য পালন করতে চাও ?"

জয়ন্ত উৎফুল্ল স্বরে বললে, "উঁহু, এই মরা কুকুর আর বিড়ালকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে চাই।"

- "কি আশ্চর্য্য, কেন ?"

– "আমার বিশ্বাস, এরা মারা পড়েছে বিষের চোটে।"

"বেশ তো, তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন ?"

—"আমি জানতে চাই, সেটা কি-রকম বিষ। হয়তো একই গোখ্‌রো-সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে রমবাবুর, আর এই বিড়াল-কুকুরের।"

তৃতীয়

জয়ন্তের গল্প

পরদিন হন্তদন্তের মতন সুন্দরবাবু এসে হাজির জয়ন্তের বাড়ীতে! জয়ন্ত ও মাণিক ব'সে ব'সে কথাবার্ত্তা কইছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি ভৈরবের ঘর খানাতল্লাস করবার জন্যে পরোয়ানা আনতে বলেছ কেন?"

—"আমি নিজের একটা সন্দেহ দূর করতে চাই!"

—"সন্দেহ আবার কিসের?

জয়ন্ত সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আমি সেই কুকুর আর খিড়ালের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি।"

—"ক'রে কি লাভ হ'ল?"

—"জানতে পারলুম, যে সেই বিড়াল আর কুকুরের মৃত্যু হয়েছে গোখরো-সাপের বিষে।"

—"হুম্! কি আশ্চর্য্য!"

—"আরো আশ্চর্য্য এই যে, তাদের কাউকেই সাপে কামড়ায় নি।"

সুন্দরবাবু চমকে বললেন, "অ্যাঁঃ! তাহ'লে তারাও রামবাবুর মত সাপের কামড় না খেয়েও সাপের বিষে মারা পড়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"এ কী রহস্য !"

—"বিড়ালের থাবাগুলোও আমি পরীক্ষা করেছি।"

—"থাবা ?"

—"হ্যাঁ, থাবা। তার থাবাগুলোর প্রত্যেক নখেই মাখানো ছিল গোখ্‌রো সাপের বিষ।"

—"এ আবার কি ব্যাপার বাবা ?"

—"কোন লোক বিড়ালটাকে ধ'রে তার নখে বিষ মাখিয়ে দিয়েছে।"

—"মানে ?"

—"একটা মানেও আবিষ্কার করেছি।"

—"শুনি, শুনি।"

—"এই বিড়ালটাই হচ্ছে রামবাবুর হত্যাকারী।"

"ধেৎ !"

"এই নিয়ে আমি একটা গল্পও রচনা করেছি। শুনবেন ?"

—"আরে না, না ! আমার এখন বাজে গল্প শোনবার সময় নেই।"

—"তবু শুনুন।"

—সুন্দরবাবু নাচারের মতন মুখভঙ্গি করলেন।

জয়ন্ত বললে, "মনে আছে, রামবাবুর বাড়ীর একতালার ভাড়াটিয়া কি কি বলেছে ? প্রথমত, রামবাবু থিয়েটার থেকে ফিরে খুব জোরে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় ভৈরবের অধিকৃত দোতালায় একটা

বিষম খেঁকী বিড়ালের আর্ত্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, রাত প্রায় ছুটোর সময়ে বাড়ীর পাশে খানায় একটা বিড়াল আর একটা কুকুর ঝগড়া করেছিল। চতুর্থত, রামবাবুর মৃতদেহের পায়ে বিড়ালের আঁচড়ের দাগ ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারটাই তুচ্ছ। কিন্তু এরই উপরে দাঁড় করিয়েছি আমার গল্পের কাঠামো।"

—"যত সব বাজে কথা!"

—"আচ্ছা, এখন আমার গল্প শুনুন। ভৈরব হচ্ছে একটি ঝানু লোক। সে কোনগতিকে টের পেয়েছিল, রামবাবুর লোহার সিন্ধুকে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা! এই টাকার উপরে তার লোভ হয়। তাই সে এক অদ্ভুত উপায়ে রামবাবুকে হত্যা করবার সংকল্প করে। ঘটনার দিন বৈকালে সে একটা প্রায়-বন্য বিড়ালকে বন্দী করে। তার কাছে আগে থাকতেই গোখ্‌রো সাপের বিষ সংগ্রহ করা ছিল। সেই বিষ সে জোর ক'রে বন্দী বিড়ালটার চার থাবার নখে মাখিয়ে দেয়। এই কারণেই দোতালায় বিড়ালের আর্ত্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তেতালায় ঘর বন্ধ ক'রে রামবাবু থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে যান। ভৈরব লুকিয়ে বিড়ালটাকে নিয়ে তেতালায় ওঠে। খড়খড়ির পাখির ফাঁকে হাত গলিয়ে জানলা খোলে। বিড়ালটাকে ঘরের ভিতরে পূরে দিয়ে আবার জানালা বন্ধ করে। তারপর "নিমন্ত্রণ-বাড়ী যাচ্ছি" ব'লে বাড়ী থেকে স'রে পড়ে—সকলের সন্দেহের বাইরে

থাকবে ব'লে। তারপর থিয়েটার দেখে রামবাবু ফিরে আসেন। নিজের ঘরের দরজা খোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পালাবার পথ খোলা পেয়ে ভীত আর ক্রুদ্ধ বিড়ালটা ছুটে আসে, আর তাঁর পায়ে আঁচড়ে দিয়ে বাইরে পালিয়ে যায়। রামবাবু ভয় পেয়ে সজোরে দরজা বন্ধ ক'রে দেন। তার খানিকক্ষণ পরে বিড়ালের বিষাক্ত নখের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রামবাবুর মৃত্যু হয়। তারপর শেষ-রাতে ঘটনাস্থলে ভৈরবের আবির্ভাব। রামবাবু নিশ্চয়ই ঘরের দরজায় খিল দেন নি। ভৈরব ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। মৃতের পকেট থেকে চাবি নিয়ে লোহার সিন্ধুক খোলে।"

সুন্দরবাবু দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললেন, "হুম্! এমন খুনের কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু ভৈরবের অপরাধ তুমি প্রমাণ করবে কেমন ক'রে?"

জয়ন্ত বললে, "হয়তো তার ঘর খানাতল্লাস করলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। হয়তো সে ভেবেছে পুলিস এই আশ্চর্য্য খুনের রহস্য বুঝতে পারবে না, তাই এখনো সাবধান হয় নি।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না জয়ন্ত, এখনো সব রহস্য পরিষ্কার হ'ল না। ঐ একই গোখ্‌রো সাপের বিষে কুকুর আর বিড়ালেরও মৃত্যু হ'ল কেন?"

—জয়ন্ত বললে, "এ-কথাও আমি ভেবে দেখেছি। ভুলবেন না, ঘটনার রাত্রে বাড়ীর পাশের খানায় কুকুর

আর বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কুকুরটা নিশ্চয়ই বিড়ালটাকে তাড়া ক'রে তার পিছনে পিছনে খানায় গিয়ে ঢোকে। সেখানে তাদের ভিতরে মারামারি হয়। বিড়ালের নখের বিষে কুকুর মারা পড়ে।”

—“আর বিড়ালটা ?”

—“সেও নাকে-মুখে কুকুরের কামড় খেয়েছিল। তারপর ক্ষতস্থানে যখন নিজের থাবা বুলোচ্ছিল, তখন নখের বিষ গিয়ে মিশেছিল তারও রক্তে।”

সুন্দরবাবু বললেন, “তোমার অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু আদালতে এ-সব কথা প্রমাণ করা সহজ হবে না। এ-সব যেন ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন শোনাচ্ছে !”

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “আদালতের কথা পরে হবে। আপাতত এখানে ব'সে সময় নষ্ট না ক'রে ঘটনাস্থলে যাত্রা করাই উচিত।”

সুন্দরবাবু বললেন, “ঠিক ! তাই চল।”

কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে শোনা গেল, ভৈরব গত রাত্রেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে, এখনো ফিরে আসে নি।

জয়ন্ত বললে, “সে বোধহয় আর ফিরবেও না। ভৈরব আমাদের সন্দেহ করেছে। আমি যে বিড়ালের মৃতদেহ আবিষ্কার করব এতটা সে ভাবতে পারে নি।”

চতুর্থ

'স্যারং' ও 'প্যারাং প্রভৃতি

সুন্দরবাবু বললেন, "একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না জয়ন্ত! ভৈরব কেমন ক'রে আন্দাজ করলে যে আমরা তাকে সন্দেহ করেছি?"

জয়ন্ত বললে, "খুব সহজেই। তার চোখের সামনেই আমরা যে মরা বিড়ালটাকে আবিষ্কার করেছি! যে লোক এমন অদ্ভুত উপায়ে নরহত্যা করতে পারে সে তো নির্ব্বোধ নয় সুন্দরবাবু!"

—"হুম্, তাহ'লে তোমার বিশ্বাস ভৈরব আর ফিরবে না?"

—"হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। তার পক্ষে এখন ফিরে আসা মানে আত্মহত্যা করা! তাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরই।"

—"কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজব?"

—"সে কথা একটু পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত তার ঘর খানাতল্লাস করা দরকার, চলুন।"

দোতালায় ছিল তিনখানা কামরা ও একখানা রান্নাঘর। তার মধ্যে একটি ঘর বাহির থেকে তালাবন্ধ। জিজ্ঞাসা ক'রে

জানা গেল, সেখানা হচ্ছে ভৈরবের শোবার ঘর। তালা ভেঙে ঘরের দরজা খুলে ফেলা হ'ল।

সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "ভৈরব দেখছি আসবাব-পত্তর কিছুই নিয়ে যায়নি। হয়তো সে ফিরে আসবে।"

জয়ন্ত বললে, "আসবাব রেখে গেছে সে আমাদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে। যাতে আমরা ভাবি সে পালায় নি। ভৈরবের সঙ্গে আছে পাঁচলক্ষ টাকা, তার কাছে এই আসবাবগুলো তো তুচ্ছ!"

মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, "জয়ন্ত, আন্‌লায় কি ঝুলছে, দেখছ?"

—"হুঁ, 'স্যারং'!"

—"আরে, টেবিলের উপরে যে একখানা 'ক্রিশ' রয়েছে!"

—"আর এই দেখ, একখানা 'প্যারাং'!"

—"এদিকে রয়েছে 'রাত্যানে'র তৈরি একটা 'বাস্কেট', ঘরের কোনেও দেখছি 'রাত্যানে'র লাঠি!"

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, স্যারাং, ক্রিশ, প্যারাং, রাত্যান! এ-সব কি কথা বাবা?"

জয়ন্ত বললে, "স্যারং মানে হচ্ছে একরকম কাপড়। প্যারাং একরকম বড় ছুরি! ক্রিশও আর একরকম ছুরির নাম। রাত্যান একজাতের গাছ, তা দিয়ে দড়ি, লাঠি আর ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।"

—"ও-সব কোন্ দেশের কথা ?"

—"মালয় উপদ্বীপের। সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও ঐ জিনিসগুলির চলন আছে।"

—"থাক্-গে, ও-নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে রাজি নই।"

টেবিলের 'ড্রয়ার' টেনে খান-কয়েক খাম বার ক'রে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "খামগুলোর উপরেও দেখছি সুমাত্রার ডাকঘরের ছাপ। বোধ হচ্ছে ভৈরব ও-অঞ্চলে অনেকদিন বাস করেছিল। এখনো তার বন্ধুরা সেখান থেকে তাকে চিঠিপত্র লেখে।—বটে, বটে, বটে!" জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, তার মুখে চিন্তার ছায়া।

সুন্দরবাবু এটা-ওটা-সেটা নাড়তে নাড়তে বললেন; "যত-সব বাজে জিনিষ। এখানে ভৈরবের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নেই। চল জয়ন্ত, আর মিছে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি ?"

জয়ন্ত হঠাৎ বললে, "রামবাবুর ঘরে টেলিফোন দেখেছিলুম না ?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু কেন ?"

জয়ন্ত কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন "মাণিক, তোমার বন্ধুর মৎলোব কি বল তো ? ও কখন যে কি বলে আর কি করে. কিচ্ছু বোঝা যায় না! হুম্!"

মাণিক সহাস্যে বললে, "অতএব জয়ন্তকে বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিন। কি জানি, যদি শেষটা আপনার মূল্যবান মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায়?"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমি কি তোমার ঠাট্টার পাত্র?"

খানিক পরেই জয়ন্ত ফিরে এসে বললে, "টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলুম, আজ বেলা সাড়ে-বারোটার সময় ডায়মণ্ড হারবার থেকে একখানা জাহাজ ছাড়বে—রেঙ্গুন হয়ে সে যাবে সিঙ্গাপুরের দিকে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাতে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি?"

—"ইচ্ছা করলে এখনো আপনি সেই জাহাজখানা ধরতে পারেন।"

—"কেন শুনি?"

—"ভৈরব হয়তো সেই জাহাজে আছে।"

—"হয়তো?"

—"হ্যাঁ, এটা আমার আন্দাজ।"

—"আন্দাজের একটা কারণ আছে তো?"

—"ভৈরবের কথা মনে আছে? সে ভবঘুরে। ভারতের বাইরেও তার গতিবিধি আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভৈরব মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে বহুকাল বাস করেছে।

এই ঘরে তার ব্যবহার-করা জিনিষগুলো এ-বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। এখনো ও-অঞ্চল থেকে তার নামে চিঠিপত্র আসে। আমার মনে হয়, যে-উপায়েই হোক্ অর্থাভাব দূর করবার জন্যেই সে কলকাতায় এসেছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই সে নরহত্যা করেছে। এখন জানতে পেরেছে যে, আমরা তার গুপ্তকথা ধরে ফেলেছি। এমন অবস্থায় ফাঁশিকাঠকে ফাঁকি দিতে হ'লে প্রথম সুযোগেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তার পক্ষে কোন্ দেশে যাওয়া স্বাভাবিক? নিশ্চয় মালয় বা সুমাত্রার দিকে! সেখান থেকে অদৃশ্য হবার পর এই প্রথম জাহাজ যাচ্ছে ঐ অঞ্চলে। এমন সুযোগ সে ছাড়বে ব'লে মনে হয় না।"

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "তোমার আন্দাজটা সত্য হ'লেও হ'তে পারে। তুমিও আমার সঙ্গে চলনা কেন?"

জয়ন্ত বললে, "আমার অন্য কাজ আছে।"

—"তোমার আবার কাজ কি?"

—"দেশে এসে পর্য্যন্ত বাঁশী বাজাই নি। আজ বাঁশী বাজাব। চল মাণিক!" জয়ন্ত ও মাণিক চ'লে গেল।

সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, "এমন পাগল কি দুনিয়ায় দুটি আছে?"

সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত নিজের ঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছে, হঠাৎ টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "হ্যালো!—"

—"কে, জয়ন্ত?"

—"হ্যাঁ।—"

"আমি সুন্দরবাবু,— কেল্লা ফতে! বাহাদুর ভায়া! তোমার আন্দাজই সত্য। ভৈরবকে গ্রেপ্তার করেছি!"

—"সাধু, সাধু!"

—"কিন্তু বেটা ভারি বেগ দিয়েছে। দেখা হ'লে সব বলব। পাঁচলক্ষ টাকার নোট সে গঙ্গায় ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তবে সে আর একটা কি জিনিষ জলে ফেলে দিয়েছে। সেটাকে দেখতে ছোট শিশির মতো।"

জয়ন্ত বললে, "তার ভিতরে কি ছিল, আমি বলতে পারি।"

—"বল দেখি?"

—"গোখ্‌রো সাপের বিষ।"

—"হুম্‌, হুম্‌, হুম্‌,!"

মরণ-বিজয়ীর দল

রবীন্দ্রনাথের মুখে তোমরা বন্দীবীর বান্দার অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করেছ। চিত্তোত্তেজক গল্পের দিক দিয়ে ধরলে, এ গাথাটির তুলনা নেই।

কিন্তু এখানে সাধারণ পাঠকের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ আমরা বলব ইতিহাসের কথা, এবং রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি পাঠ করলে ঐতিহাসিকেরা বোধ করি খুব বেশী অভিভূত হবেন না।

বান্দা যে জাতির জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন হাসিমুখে, সে কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে মুসলমান নরনারী—এমন কি অজাত শিশুরও উপরে তিনি যে অকথ্য, অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার করেছিলেন, ইতিহাসে তা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। অধিকন্তু, বান্দার অনুচরদের কবল থেকে বহু হিন্দুও মুক্তিলাভ করতে পারে নি। এই সব কথা মনে করলে বান্দার প্রতি আমাদের সহানুভূতি যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং বলতে ইচ্ছা হয় যে, বান্দা একজন সাধারণ অপরাধী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দা কেমন ক'রে স্বহস্তে নিজের পুত্রকে বধ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, বান্দা স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেন নি। ব্যাপারটা হয়েছিল আরো মর্ম্মন্তুদ, আরো ভয়ানক।

বধ্যভূমিতে (দিল্লীর কুতব মিনারের সামনে) বন্দী বান্দার কোলে তাঁর তিন বছরের ছেলেকে তুলে দিয়ে বলা হ'ল, "ওকে হত্যা কর।"

বান্দা হুকুম গ্রাহ্য করলেন না। এমন হুকুম তামিল করতে পারে না কোন পিতাই।

ঘাতক তখন এক সুদীর্ঘ ছুরিকার আঘাতে শিশুকে হত্যা করলে, এবং তার উদরের ভিতর থেকে যকৃত টেনে বার ক'রে ঢুকিয়ে দিলে বান্দার মুখের ভিতরে।

তারপর বিষম যন্ত্রণা দিয়ে একে একে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বান্দাকেও হত্যা করা হ'ল।

কয়েক বৎসর ধ'রে পাঞ্জাবের দিকে দিকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর যুদ্ধ ক'রে বান্দা শেষটা সদলবলে বন্দী হ'লেন গুরুদাসপুর গড়ে। (১৭১৫ খৃঃ) দীর্ঘ ছয় বৎসর ধ'রে যে বিদ্রোহী মোগল-সম্রাটের বিপুল জনবল ও অর্থবল ব্যয় ক'রে এসেছিলেন, তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে পাওয়া গেল মাত্র ১০০০ হাজার তরবারি, ২৭৮

ঢাল, ১৭৩ ধনুক, ১৮০ বন্দুক, ১১৪ ছোরা, ২১৭ লম্বা ছুরি, খানকয় সোনার গহনা, ২৩টি মোহর, ও কিছু-বেশী ৬০০ টাকা!

গুরুদাসপুর গড়ও মোগলরা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে পারে নি, কেবল নির্জ্জল উপবাসের যন্ত্রণা আর

সইতে না পেরেই শিখরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ শিখদের দুর্দ্দশা এমন চরম হয়ে উঠেছিল যে, অনেকে নাকি অন্য খাদ্যের অভাবে আপন আপন উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তারই সাহায্যে করেছিল উদর-পূর্ত্তি!

গুরুদাসপুর গড়ের পতনের পর যে নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হয় এবং শিখদের যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিয়ে একাধিক বিচিত্র কাব্য রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে কবিতা কিংবা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করব না। সাদাসিধে ভাষায় সোজাসুজি মূল ঘটনাগুলি বর্ণনা ক'রে যাব। দেখবেন, তার ভিতরেই বীরত্বের অসাধারণ রূপ ফুটে উঠে হৃদয়কে অভিভূত ক'রে দেবে কতখানি!

অগুন্তি শিখকে হত্যা করা হ'ল। সাত শত চল্লিশ জন শিখ হ'ল বন্দী। দিল্লীর রাজ-দরবার থেকে হুকুম এল—ছত্রপতি শিবাজীর পুত্র রাজা শম্ভুজীকে বন্দী ক'রে যে-ভাবে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, বান্দা ও তাঁর অনুচরদেরও সেইভাবে দিল্লীতে নিয়ে আসতে হবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দিল্লী-দুর্গের লাহোরী ফটক থেকে আরামাবাদ পর্য্যন্ত কয়েক মাইল ব্যাপী পথের দুইধার জুড়ে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈনিকরা। এবং পথের উপরে ভেঙে পড়ল বিপুল জনতা-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ!

প্রথমেই দেখা গেল, হাতীর উপরে লোহার খাঁচা এবং তার ভিতরে বন্দী বান্দা। অঙ্গে তাঁর স্বর্ণখচিত সমুজ্জ্বল ও বহুমূল্য পোষাক। পিছনে দাঁড়িয়ে লৌহবর্ম্মধারী মোগল সেনানী, হাতে তার নগ্ন তরবারি। বান্দার হাতীর সুমুখে দেখা যাচ্ছে শত শত বংশদণ্ডের উপরে নিহত শিখ যোদ্ধাদের ছিন্নমুণ্ড, তাদের লম্বা চুলগুলো মুখের উপরে প'ড়ে ঝুলছে ঝালরের মত।

বান্দার হাতীর পিছনে পিছনে আসছে দলে দলে উট। প্রত্যেক উটের উপরে ব'সে আছে দুজন ক'রে শিখ-বন্দী। তাদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিসদৃশ পোষাক, অনেককে দেখতে হয়েছে পশুর মত।

জনতার মধ্যে জাগল ঘন ঘন জয়ধ্বনি! বন্দীদের লক্ষ্য করে অনেকে টিট্‌কারি দিতে লাগল। কিন্তু বন্দীরা তা শুনে বিচলিত হ'ল না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা কেউ ভীত ভাব প্রকাশ করলে না, বরং অনেকের মুখ দেখলে মনে হয় যেন তারা চলেছে কোন উৎসব-সভার দিকে!

কেউ ঠাট্টা করলে তখনি তারা নির্ভয়ে পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়লে না। কেউ তাদের 'খুন করব' বলে ভয় দেখালে তারা বলে, "মারো, আমাদের মেরে ফেল—মৃত্যুকে আমরা ভয় করব কেন? কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা সইতে না পেরেই আমরা তোমাদের হাতে ধরা দিয়েছি! আমাদের সাহস আর বীরত্ব কি তোমরা জানো না?"

স্থির হল, প্রতিদিন একশো জন ক'রে বন্দীকে বধ করা হবে।

বধ্যভূমিতে দর্শকদের দলে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোকও। সকলেই বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শিখ বন্দীরা যে ধীরতা, দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিলে, তা বিস্ময়কর।

বন্দীদের বলা হ'ল, "জীবনভিক্ষা চাও তো মুসলমান হও !"

প্রত্যেক বন্দী এক-কণ্ঠে বললে, "মুণ্ড দেব, ধর্ম্ম দেব না !

তাদের কারুর এতটুকু মৃত্যু-ভয় নেই, ঘাতককে ডাকতে লাগল "মুক্তিদাতা" বলে। সকলে মহা আনন্দে ঘাতকের সামনে ছুটে গিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "মুক্তিদাতা, আগে আমাকে হত্যা কর !"

সাড়ে সাতশত শিখ বন্দী ! প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তরবারি শূন্যে ওঠে চমকিয়ে এবং পর-মুহূর্ত্তে নীচে নেমে উড়িয়ে দেয় এক এক বীরের মুণ্ড। কাটতে কাটতে তরবারি ভোঁতা হয়ে যায়, আবার তাকে শানিয়ে নিতে হয়। সাতশত চল্লিশ জন বন্দীর ভিতর থেকে একজনমাত্র মৃত্যুভীত কাপুরুষকে পাওয়া গেল না। সাতশত চল্লিশজন মহাবীর একে একে মুণ্ড দিলে, ধর্ম্ম দিলে না। সাতশত চল্লিশজন মহাবীরের রক্তশোষণ করে বধ্যভূমি হয়ে উঠল বীরভূমি।

বান্দা তো দলের নেতা, সবদিক বুঝে প্রস্তুত হয়ে [illegible]নি ধারণ করেছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। কিন্তু এই [illegible]

চল্লিশ জন শিখ, এদের অধিকাংশই সাধারণ লোক—অনেকেই হয়তো নিরক্ষর ও চাষাভূষা শ্রেণীর। তবু এদের কেউ ধর্ম্মের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা করলে না। বান্দার মৃত্যুর চেয়েও এদের আত্মদান অধিকতর গৌরবময়।

প্রতিদিন উচ্চ হয়ে ওঠে মৃতদেহের স্তূপ। মৃত্যুর পরেও বীর দেহগুলির উপরে কিছুমাত্র সম্মান প্রকাশ করা হ'ল না। গাড়ীতে করে দেহের স্তূপ নগরের বাইরে চালান করা হ'ল। তারপর প্রত্যেক দেহকে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল গাছের ডালে।

কিন্তু এরও চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মরণের ভয়ের কথাই জানি, মরণের আনন্দের কথা বড় একটা শোনা যায় না। আজীবন প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, জীবনকে ঘৃণা করবার ও মরণকে ভালোবাসবার আশ্চর্য্য সুযোগ হয় কয়জনের?

কুতব-উল্-মুল্ক্ ছিলেন তখন ভারত-সম্রাটের উজির। তিনি হচ্ছেন সেই ইতিহাস-বিখ্যাত সৈয়দ-ভ্রাতৃযুগলের অন্যতম—যাঁদের প্রভাবে বা কৃপা-কটাক্ষে ময়ুর-সিংহাসনের উপরে বসেছেন সম্রাটের পর সম্রাট। কুতব-উল্-মুল্ক্-এর হিন্দু দেওয়ানের নাম রতনচাঁদ। তিনি উজিরের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

এক নারী রতনচাঁদের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ল।

নারী বললে, "হুজুর, আমি অসহায়া বিধবা। আমাকে দয়া করুন।"

রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

—"আমি এক বালক শিখ বন্দীর মা।"

—"আমার কাছে এসেছ কেন ?"

—"আমার বালক পুত্রের উপরে প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে। ঐ ছেলেটি ছাড়া এই ছুনিয়ায় আমাকে আর দেখবার লোক কেউ নেই। সে মারা পড়লে আমার কি গতি হবে হুজুর ?"

—"তোমার ছেলেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে বালক হ'তে পারে, কিন্তু রাজবিদ্রোহী।"

—"হুজুর, আমার ছেলে রাজবিদ্রোহী নয়। এমন কি সে গুরু বান্দার শিষ্যও নয়। তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। তাকে ভুল ক'রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হুজুর তাকে রক্ষা করে এই অনাথাকে রক্ষা করুন।"

অবশেষে মায়ের সেই করুণ ক্রন্দন আর সহ্য করতে না পেরে দেওয়ান রতনচাঁদ তার আরজী নিয়ে গেলেন উজিরের কাছে। প্রিয়পাত্রের অনুরোধ এড়াতে না পেয়ে কুতব-উল্-মুল্ক্ সেই বিধবা নারীর বালক পুত্রকে জীবন ভিক্ষা দিলেন।

(বেচারা মা আনন্দের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে উজিরের আদেশ-পত্র নিয়ে ছুটল কোতোয়ালের কাছে।)

বন্দীকে কারাগারের বাইরে এনে কোতোয়াল বললে, "তুমি মুক্ত।"

বালক সবিস্ময়ে বললে, "আমি মুক্ত? না, না, এ অসম্ভব।" . .

তার মা কাছে এগিয়ে এসে বললে, "হ্যাঁ বাছা, তুমি মুক্ত! তুমি তো বিদ্রোহী গুরুর শিষ্য নও, তাই আমার কথা শুনে উজির-মশাই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।"

ভয়াবহ মৃত্যুকে পিছনে রেখে সামনে এসে দাঁড়াল নব-যৌবনের উদ্দাম জীবন! নূতন আশায় উচ্ছ্বসিত জননীর স্নেহহাসিমাখা মুখ! কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে হৃদয়ের আবেগ দমন ক'রে বালক কঠিন স্বরে কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে, "কে এই নারী?"

কোন জননীর সামনে কোন পুত্রের মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা বোধ হয় আর কখনো উচ্চারিত হয় নি! মা তো একেবারে অবাক! হয়তো ভাবলেন, জেলখানায় গিয়ে মৃত্যুভয়ে ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

কোতোয়াল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "সেকি, ইনি যে তোমার মা!"

বালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "না, এই নারীকে আমি চিনি না!"

—"ইনি তোমার মা নন?"

—"না। ইনি কি চান তাও আমি জানি না। এঁর কথা সত্য নয়। আমি বিদ্রোহী, আমি গুরুজীর শিষ্য!

গুরুজীর সঙ্গে আমিও প্রাণ দিতে চাই! জয়, গুরুজীর জয়!"

বালক জীবন ভিক্ষা নিলে না, দান করলে।

পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে আছে এর চেয়ে অদ্ভুত কাহিনী?

প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ

(ক)

বিধু বলত, "ম্যাট্রিক পাস ক'রেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ হব।"

বিধু যে ম্যাট্রিকের ফটক পেরুতে পারবে, এত-বড় দুরাশার জন্ম অসম্ভব। বিড়ালের কাছে কুকুর যেমন, তার কাছে ইস্কুলের বইগুলোও ছিল তেমনি চক্ষুশূল। দিন-রাত পড়ত খালি গোয়েন্দা-কাহিনী!

অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনী প'ড়ে প'ড়ে বিধুর এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ডিটেক্‌টিভ হ'তে গেলে যা' যা' জানা দরকার সে-সবের কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই!

বিধু যখন-তখন নাক মুখ সিঁটকে বলত, "যত হাঁদারাম গিয়ে বাংলাদেশের পুলিসের দলে ভর্ত্তি হয়েছে। চোর-ডাকাত ধরবার আসল ফন্দিই তারা জানে না। সার্লক হোম্‌সের মত পাকা ডিটেকটিভ এখানে নেই। আমিই হব বাংলাদেশের প্রথম সার্লক্ হোম্‌স্।"

বিধুর মুখে রোজ এমনি সব কথা শুনে শুনে ক্রমে আমারও তার বুদ্ধি আর শক্তির উপরে শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল।

যখন শোনা যেত অমুক জায়গায় খুব বড় চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু পুলিস চোর ধরতে পারছে না, বিধু তখন আফ্‌সোস্ ক'রে

বলত, "ওঃ, বাংলাদেশের পুলিস কেবল 'ফুলিস্' নয়, বদ্ধ অন্ধও! আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি, ঘটনাস্থলে চোর নিশ্চয় কোন চিহ্ন রেখে গেছে! একটা বোতাম, আঙুলের দাগ, কি একটা পায়ের ছাপ্! তাই দেখেই আমি চোর ধ'রে দিতে পারি! এ-সব মামলার কিনারা করবার জন্যে পুলিস আমার কাছে আসে না কেন? বিলাতের পুলিশ তো সার্লক্ হোম্‌স্-এর কাছে আনাগোনা করত!"

আমি চমৎকৃত হয়ে বলতুম, "ভাই বিধু, এদেশে কেউ তোমাকে চিনতে পারলে না গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না কিনা! কিন্তু তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি গর্ব্বিত!"

বিধু মুরুব্বিআনা-চালে বার-দুয়েক আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বলত, "সার্লক্ হোম্‌সের সঙ্গে ছায়ার মতন থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন। তুমিই হবে আমার ওয়াটসন্! আমরা দুজনে বাংলাদেশের চোর-ডাকাতের বংশ নির্ম্মূল ক'রে ছাড়ব!"

আমি বলতুম, "এ আমার সৌভাগ্য!"

সেইদিন থেকেই বিধু আমাকে ওয়াট্‌সন্ ব'লে ডাকতে সুরু করলে।

(খ)

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনা, হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ীতে হ'ল এক দুষ্ট চোরের আবির্ভাব।

রাত্রে চোর এসে লোহার সিন্ধুক খোলবার চেষ্টা করছিল। পাশের ঘরে ছিলেন বাবা। হঠাৎ কি শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে গোলমাল করতেই চোর দেয় চম্পট! কিচ্ছু চুরি করতে পারে নি।

বিধু সেই খবর শুনেই উত্তেজিত হয়ে বললে, "ওয়াট্‌সন্, এই ব্যাপার থেকেই আমাদের ডিটেক্‌টিভ-জীবনের পত্তন করা যাক্! যে চুরি করতে এসেছিল আমি তাকে ধ'রে দেব!"

সবিস্ময়ে বললুম, "কেমন ক'রে?"

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্য্যের বোঝা চাপিয়ে বললে, "ডিটেক্‌টিভের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, সূত্র আবিষ্কার করা। ঘটনাস্থলে চোর কিছু চিহ্ন রেখে গেছে?"

—"গেছে। একটা কোট।"

—"কোট? কোট তো থাকে গায়ে, চোর সেটা ফেলে গেছে কেন?"

—"কাল রাতে কি-রকম গুমোট্ গরম গেছে জানো তো? সিন্ধুক খোলবার আগে কাজের সুবিধা হবে ব'লে চোর বেটা বোধ হয় কোটটা গা থেকে খুলে রেখেছিল। তারপর তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়িতে কোটটা নিয়ে লম্বা দিতে পারে নি।"

আমার পিঠ চাপড়ে বিধু বললে, "ওয়াট্‌সন, তোমার আন্দাজ করবার শক্তি দেখে খুসি হলুম! বহুৎ আচ্ছা, নিয়ে এস সেই কোটটা!"

এক দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে কোটটা নিয়ে এলুম। ছোট ছোট চৌকো ঘর-কাটা ছিটের কোট।

কোটের পকেট থেকে বেরুলো এক প্যাকেট 'পাসিং সো' সিগারেট আর কাগজে-মোড়া খানিকটা দোক্তা। এবং একটা আধ্‌লা।

বিধু একটা ফিতে নিয়ে কোটটা খানিকক্ষণ ধ'রে মাপ্‌লে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, "ওয়াট্‌সন, যে এই কোটের মালিক, সে পান খেতে ভালোবাসে, সে বড়লোক নয়, সে দেহে খুব লম্বা-চওড়া!"

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললুম, "কি ক'রে এমন অদ্ভুত আবিষ্কার করলে?"

—"সে চীনের বাদামও খায়!"

—"কি আশ্চর্য্য, কি ক'রে জানলে?"

—"পকেটে যে দোক্তা নিয়ে বেরোয় সে পানের ভক্ত না হয়ে যায় না। যার সম্বল খালি একটা আধলা আর যে 'পাসিং সো'র মতন কম-দামের সিগারেট ব্যবহার করে নিশ্চয়ই সে বড়লোক নয়। কোটের গলা, ছাতি আর ঝুলের মাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটার দেহ খুব লম্বা-চওড়া। পকেটের ভেতরে কতকগুলো চীনের বাদামের খোসা পেয়েছি, সুতরাং চোর চীনের বাদামও খায়।"

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, "ধন্য বিধু, ধন্য তোমার বুদ্ধি!"

বিধু গর্ব্বিত কণ্ঠে বললে, "চোরের চেহারা আর স্বভাব জানা গেল। এখন তাকে গ্রেপ্তার করতে আর বেশী দেরি লাগবে না। বলতে কি, সে তো আমার এই হাতের মুঠোয়"—ব'লেই সে হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে তুলে ধরলে।

আমি বিস্ফারিত চোখে রোমাঞ্চিত দেহে বিধুর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে রইলুম—যদিও বুঝতে পারলুম না যে, তার অতটুকু মুঠোর ভিতরে অত-বড় একটা চোর বন্দী হবে কেমন ক'রে।

বিধু আবার বললে, "ধিক্ এই বাংলাদেশের পুলিস! এইবারে দেখুক তারা, বুদ্ধি থাকলে কত সহজে টপ্ ক'রে চোর ধরা যায়!"

(গ)

বিধু মুখে আবার বিপুল গাম্ভীর্য্যের ভাব এনে বললে, "ডিটেকটিভের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে, সর্ব্বদা সতর্ক চোখ খুলে রাখা।"

আমি বল্লুম, "হ্যাঁ, সর্ব্বদা চোখ খুলে রাখলে চোখে কিছু পড়বেই—অন্তত পোকা-মাকড়টাও।"

তারপর কিছুকাল বিধু পথে-পথেই দিন কাটায়। আমাকেও দায়ে প'ড়ে তার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকতে হয়—কারণ, আদি সার্লক্ হোম্সের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকতেন, তাঁর বন্ধু ওয়াট্সন্, আর আমি হচ্ছি সেই ওয়াট্সনেরই মূর্ত্তিমান দ্বিতীয় সংস্করণ! না বলবার যো নেই।

ঘুরে ঘুরে পায়ে পড়েছে যখন ফোস্কা এবং রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের রং হয়েছে যখন তামাটে, তখন হঠাৎ একদিন আমাদের খুলে-রাখা সতর্ক চোখে পড়ল একটি অতিশয় সন্দেহজনক মূর্ত্তি!

বিধু উত্তেজিত আনন্দে একটি লম্ফত্যাগ ক'রে বললে, "ওয়াটসন, দেখছ লোকটার চেহারা কি-রকম লম্বা-চওড়া?"

—"হুঁ"

—"ওর গায়ের কোটটা দেখ!"

—"ছোট ছোট চৌকো ঘর-কাটা ছিটের কোট। চোর আমাদের বাড়ীতে যে-কোটটা ফেলে গেছে ঠিক যেন তারই জোড়া।"

—"লোকটা একটা সিগারেটও টানছে। কিন্তু ওটা কি সিগারেট?"

'পাসিং সো' হ'তে পারে। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসব নাকি?"

—"ওয়াটসন্, তুমি একটি আস্ত এবং মস্ত ass! তাহলে ও সন্দেহ করবে যে!······আরে দেখ দেখ, লোকটা কাকে ডাকলে!"

—"চীনেবাদামওয়ালাকে।"

—"সব হুবহু মিলে যাচ্ছে! চল, আমরা ওর পিছু নি!"

পিছু নিলুম। আধ-ঘণ্টা এ-পথে সে-পথে ঘুরে ঘুরে লোকটা একটা পানওয়ালার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিধু তফাৎ থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, "ওয়াট্‌সন, এ কি হ'ল! ও যে 'গোল্‌ড্‌ফ্লেক্‌' সিগারেটের প্যাকেট কিনলে!"

—"বেটা বোধহয় অন্য-কোথাও চুরি ক'রে হঠাৎ বড়লোক হয়ে পড়েছে!"

—"ওয়াট্‌সন, তুমি একটি জিনিয়াস! ঠিক ধরেছ! এখন একবার যদি ওর কোটটা হাতে পাই!"

—"তাহ'লে কি হবে?"

—"চোরের কোটের সঙ্গে ওর কোটের মাপ মিল্‌লেই তো কেল্লা ফতে!"

—"কিন্তু ও তোমার হাতে কোটটা দেবে কেন?"

—"সেইটেই তো সমস্যা! লোকটা গুণ্ডার মতন দেখতে। জোর ক'রে কোট দেখতে চাইলে হয়তো ধাঁ-ক'রে মেরেই বসবে।"

লোকটা আবার চলতে সুরু করল। আমরাও তার সঙ্গ ছাড়লুম না।

তারপর সে হঠাৎ একখানা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়ীখানার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিধু বললে, "আজ রাত-বারোটার সময়ে এইখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

(ঘ)

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্য্যের জাহাজ নামিয়ে এনে বললে, "ডিটেক্‌টিভের তৃতীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে, অসীম সাহসে বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করা। ওয়াট্‌সন, নিশ্চয়ই তুমি ভীত নও!"

রাত বারোটা। আবছা চাঁদের আলোয় আমরা দুজনে সেই বাড়ীখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিক কী স্তব্ধ! পথে নেই জনপ্রাণী।

তখন আমি বললুম, "আমার বিশ্বাস আমি [illegible]। আমাকে কি করতে হবে বল।"

—"বাড়ীর গা বেয়ে ঐ যে দেখছ নলটা, ঐটে অব[illegible] ক'রে দোতালায় উঠতে হবে। অবশ্য আমিও উঠব।"

প্রস্তাব শুনেই হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। কিন্তু মুখে বললুম, "তারপর?"

—"সেই লোকটা নিশ্চয়ই এখন কোন ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবার আগে কোটটা সে খুলে রেখেছে। আমাদের সেই কোটটা আবিষ্কার করতে হবে।"

—"যদি ধরা পড়ি?"

—"এটা দেখলে কেউ আর আমাদের ধরতে আসবে না! দেখছ, এটা কি?"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি মানুষ খুন করতে চাও? ওটা যে রিভলভার!"

বিধু হেসে বললে, "হ্যাঁ, নকল-রিভলভার! বিলাতী খেলনার দোকানে পাওয়া যায়। এখন এস, আমরা উপরে উঠি।"

নল বেয়ে দোতালায় ওঠার হাঙ্গামাটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। একবার হাত ফস্কালেই হয় হাসপাতাল, নয় নিমতলা-ঘাটে যাত্রা করতে হবে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। ওয়াট্‌সন্ হওয়ার এত বিপদ তা জানতুম না। মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলুম। কিন্তু তবু ছাড়ান নেই, শেষপর্য্যন্ত উঠতে হ'ল।

ফাঁড়ার প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল। জ্যান্তো অবস্থাতেই

ছাদের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু বুকের ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ শব্দ শুনতে পেলুম স্পষ্ট।

একহাতে 'টর্চ্চ,' আর একহাতে নকল-রিভলভার নিয়ে বিধু চুপিচুপি বললে, "ঐদিকে সিঁড়ি রয়েছে। পা টিপে-টিপে আমার সঙ্গে নেমে এস।"

পা টিপে-টিপেই অগ্রসর হলুম বটে, কিন্তু মনে হ'তে লাগল আমার বুকের ঢুপ ঢুপনির শব্দে সারা পাড়া এখনি জেগে উঠবে। মনে মনে বললুম, "হে মা কালী, হে মা দুর্গা! এ-যাত্রা যদি মানে মানে আমাকে রক্ষা কর, তাহ'লে আমি আর কখনো ওয়াট্‌সন্‌ হবার চেষ্টা করব না।"

কিন্তু আমার কাতর প্রার্থনা মা-কালী বা মা-দুর্গার কাছে পৌঁছবার আগেই বারান্দার ওধারের অন্ধকারের ভিতর থেকে গর্জ্জন ক'রে কে ব'লে উঠল,—"কে রে! কে রে! কে রে!" তারপরেই অতি দ্রুত পায়ের শব্দ।

বারান্দার এপাশ হাৎড়ে বিধু তৎক্ষণাৎ একটা দরজা আবিষ্কার করে ফেললে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই আমাকে টেনে নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

(৬)

বিধু বললে, "ডিটেক্‌টিভের চতুর্থ কর্ত্তব্য হচ্ছে, উপস্থিত-বুদ্ধি খাটাতে পারা। ভাগ্যিস্‌ আমি উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি, নইলে এতক্ষণে ওরা আমাদের ধ'রে ফেলত!"

খুট্ 'সুইচ-টেপার শব্দ,—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে যেন তীব্র আলোর ঝড় খেলে গেল!

এক মুহূর্ত্ত অন্ধের মত থেকে যখন আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলুম তখন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম যে, খাটের উপরে অবাক বিস্ময়ে ব'সে আছেন আমাদেরই ইস্কুলের হেড পণ্ডিতমশাই!

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না,-এও কি সম্ভব? আমাদের ইস্কুলের সদাই-খাপ্পা হেড-পণ্ডিতমশাই, ভয়ঙ্কর খোট্টাই-গাঁট্টার আবিষ্কারক রূপে ছেলে-মহলে যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত, আমরা কি আজ অজান্তে তাঁরই বাড়ীতে, তাঁরই শয়নগৃহে এসে পড়েছি? একেবারে বাঘের মুখে! ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হল!

ওদিকে বাহির থেকে ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল এবং সেই সঙ্গে চীৎকার শোনা গেল—"চোর, চোর! দাদা তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে!"

এ আবার কী হ'ল,—চোরের খোঁজে এসে নিজেরাই চোর ব'লে ধরা পড়ব নাকি?

হেড-পণ্ডিত সুধোলেন—কেরে? প্রেমলাল না? আরে, বিধুভূষণও যে! ব্যাপার কি হে, তোমার হাতে রিভলভারের মতন ওটা আবার কি? তোমরা স্বদেশী ডাকাত হয়েছ নাকি?"

ধন্য বিধু, তখনো সে উপস্থিত-বুদ্ধি হারাতে রাজি হ'ল না, সে মুখে হাসি আনবার মিথ্যা চেষ্টা ক'রে বললে, "আজ্ঞে না স্যর,

আমরা স্বদেশী ডাকাত নই—আমরা হচ্ছি প্রাইভেট-ডিটেক্‌টিভ্‌!"

—"প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্‌? বটে, বটে! তাই রাত বারোটার সময়ে চোরের মত ঢুকেছ আমার বাড়ীতে? ওদিকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ আমার ঘরে? আমাকে ন্যাকা পেয়েছ, না? আচ্ছা দাঁড়াও!"—পণ্ডিতমশাই খাট থেকে লাফিয়ে প'ড়ে বেগে তেড়ে এসে বিধু ডিটেক্‌টিভের মাথায় 'ধঠাৎ' ক'রে বসিয়ে দিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ খোট্টাই-গাঁট্টা!

ইতিমধ্যে আমার ভীত ও ব্যস্ত চোখে পড়ল, ঘরের একটা জানলায় একটা গরাদে নেই! পণ্ডিতমশাইয়ের দ্বিতীয় গাঁট্টা বিধুর মাথায় অবতীর্ণ হবার আগেই সেই ভাঙা জানলা দিয়ে আমি রাস্তায় ঝাঁপ খেলুম। হাতে-পায়ে যথেষ্ট চোট লাগল বটে, কিন্তু সুবিখ্যাত খোট্টাই-গাঁট্টার তুলনায় সে-সব আঘাত কিছুই নয়।

(৮)

পরদিন সকালে বিধু ম্লানমুখে এসে দেখালে, গাঁট্টার চোটে তার মাথার এগারো জায়গা ফুলে ঢিবি হয়ে উঠেছে।

খোট্টাই-গাঁট্টার কীর্ত্তি-দর্শন যখন শেষ হ'ল, বিধু অভিমান-ভরে বললে, "ওয়াটসন্, তুমি যে এমন কাপুরুষ আমি তা জানতুম না! আমাকে যমের মুখে ফেলে অনায়াসে চম্পট দিলে?"

দুঃখিত স্বরে বললুম, "পালিয়ে আর এলুম কোথায় ভাই, যমের মুখ থেকে কি পালিয়ে আসা যায়? ইস্কুলে গেলেই টের পাবে, খোট্টাই-গাঁট্টা আমারও জন্যে বিপুল বিক্রমে অপেক্ষা করছে!"

বিধু মাথা নেড়ে বললে, "না, তোমার আর ভয় নেই! তুমি হচ্ছ মাত্র ওয়াটসন্ আর আমি হচ্চি বাংলার সার্লক্ হোম্স্—তোমার চেয়ে ঢের বড়, আর বড় গাছই ঝড়ে পড়ে!"

বিধুর জাঁক আজ আর ভালো লাগল না। বিরক্ত ভাবে বললুম, "তার মানে?"

বিধু বললে, "সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়েই বয়ে গেছে, তোমার আর কোন ভয় নেই।"

—"তাই নাকি, গাঁট্টা-বৃষ্টি যখন থামল তুমি তখন কি করলে?"

—"আমি পণ্ডিতমশাইকে সব কথা খুলে বললুম। শুনে তিনি পাঁচ মিনিট ধ'রে হো-হো ক'রে হেসে বললেন—'এ-সব কথা জানলে আমি তোমাকে এত জোরে অতগুলো গাঁট্টা মারতুম না!' তাঁর ঘরে রসগোল্লা ছিল, আমাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে ছেড়ে দিলেন।"

—"আমরা যার পিছু নিয়েছিলুম, সে লোকটা কে?"

—"পণ্ডিতমশায়ের ভাই। আমাদের বড়ই ভুল হয়ে গেছে, আবার দেখছি গোড়া থেকে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে! ডিটেক্‌টিভের পঞ্চম কর্ত্তব্য হচ্ছে—"

বাধা দিয়ে বললুম, "তোমার ও ডিটেক্‌টিভের কর্ত্তব্যের

তালিকা রেখে দাও! মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হচ্ছে, নিজের প্রাণ বাঁচানো। আমি আর তোমার দলে নেই।"

—"সে কি ওয়াট্‌সন্?"

—"কে ওয়াট্‌সন্? আমার নাম প্রেমলাল মিত্র। নিজের নাম আর কখনো আমি ভুলব না!"

একদিনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার

(সত্য ঘটনা)

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন কুচবিহারে, মেশোমশাইয়ের কাছে। আমার বয়স তখন অল্প, কিন্তু তখন থেকেই দেখতে সুরু করেছি অ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্বপ্ন।

আমার মেশোমশাই ছিলেন স্বর্গীয় ধর্ম্ম-সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়। তিনি কুচবিহারের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ভালো শিকারী ব'লে তাঁর নামডাক ছিল যথেষ্ট। প্রায় প্রতি বৎসরেই কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তিনি শিকারে যাত্রা করতেন।

এখনকার কুচবিহার সহরের কথা বলতে পারি না, কিন্তু তখনকার সহরের আশেপাশে চিতাবাঘের অত্যাচারের কথা শোনা যেত প্রায়ই। সাধারণত তারা গৃহপালিত জীবজন্তুদের উপরেই হানা দিত বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে বাগে পেলে নরহত্যা করতেও ছাড়ত না।

মেশোমশাই মাঝে মাঝে বন্দুক কাঁধে ক'রে বেরিয়ে যেতেন এবং প্রতি বারেই ফিরে আসতেন একটা মরা চিতাবাঘ নিয়ে। দেখে-শুনে আমার ধারণা হ'ল, বাঘ শিকার করা হচ্ছে একটা ভারি সহজ ব্যাপার। বন্দুক ছোঁড়ার অভ্যাস থাকলে যে-কোন লোক বাঘ মারতে পারে।

মাঝে মাঝে আমিও মেশোমশাইয়ের পাখী-মারা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম এবং সহরের বাইরে গিয়ে পক্ষী-রাজ্যের মধ্যে করতুম দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি। প্রথম শিকারীর মতন নিষ্ঠুর জীব বোধ হয় আর নেই – কারণ জীবহত্যার আনন্দ তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসে। নতুন বন্দুক ছুঁড়তে শিখে আমিও কোন পাখীকেই রেহাই দিতুম না তা সে শকুনিই হোক্ আর কাক-বক-চিলই হোক্!

পক্ষী-শিকারে আমার সঙ্গে থাকত কুচবিহারের বাসিন্দা একটি ছেলে। এতদিন পরে নামটি আমার মনে পড়ছে না, সুতরাং তাকে প্রশান্ত ব'লেই ডাকব।

প্রশান্ত ছিল অতি-ওস্তাদ ছেলে। কোন কাকই সব-চেয়ে উঁচু ডালে বাসা বেঁধেও তার হাত থেকে রেহাই পেত না, প্রশান্ত গাছে চ'ড়ে ঘুঁড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবে ব'লে কাকের ডিম চুরি করবেই। কোন গৃহস্থই দুরারোহ পাঁচিল দিয়েও তার কবল থেকে বাগানের পাকা ফল রক্ষা করতে পারত না। প্রতি মাসে অন্তত দিন-পনেরো সে ইস্কুল থেকে পালিয়ে পথে-বিপথে টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াত, অথচ বাৎসরিক পরীক্ষায় সে নাকি নম্বর পেত সব-চেয়ে বেশী!

প্রশান্তের শিকারের সখ ষোলআনা, কিন্তু বন্দুক ছিল না। এ অভাব সে কতকটা পূরণ ক'রে নিলে ধনুকধারী হয়ে। বাঁখারি ও কঞ্চি দিয়ে স্বহস্তে তৈরি ক'রে নিলে ধনুক ও বাণ।

তার অস্ত্র দেখে আমি হেসে ফেললুম।

প্রশান্ত বললে, "হেসোনা হে ভায়া, হেসোনা! তীর-ধনুক বড় ফ্যাল্‌না নয়! ত্রেতায় রামচন্দ্র আর দ্বাপরে অর্জ্জুন এই তীর-ধনুকের জোরেই মহাবীর হ'তে পেরেছিলেন, বুঝেছ?"

আমি বললুম, "কিন্তু রাম আর অর্জ্জুন কলিকালে জন্মালে তাঁদের বীরত্বকে লুপ্ত করবার জন্যে দরকার হ'ত মাত্র একটি দোনলা বন্দুক!"

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, "না হে, না! আমি কেতাবে পড়েছি, সেকালেও বন্দুক ছিল, নাম তার নালিকাস্ত্র। কিন্তু রাম আর অর্জ্জুন তারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন ধনুক-বাণকে।"

আমি বললুম, "বেশ, তাহ'লে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ শ্রেষ্ঠ কে? তোমার ধনুক, না আমার বন্দুক?"

পরীক্ষা প্রায়ই হ'ত। সব সময়ে আমার বন্দুক যে জিত্‌ত এমন কথা বলতে পারি না, কারণ লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতা আমার চেয়ে প্রশান্তেরই ছিল বেশী।

তার সঙ্গে একদিন পাখী-শিকারে বেরিয়েছি। ঠাণ্ডা শীতে তপ্ত রোদের ছোঁয়া পেয়ে চারিদিকের শ্যামলতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত হয়ে যাচ্ছে যেন পুলকের হিল্লোল। এ-গাছ ও-গাছ থেকে কাকের দল আমাদের দুই মূর্ত্তিকে দেখেই কা কা রবে নিরাপদ ব্যবধানে উড়ে পালাতে লাগল। কাকদের সমাজে আমরা বোধ হয় 'হত্যাকারী' ব'লে মার্কা-মারা হয়ে গিয়েছিলুম।

কুচবিহার সহরের উপকণ্ঠে একটি বদ্ধ নদী আছে। আমরা প্রায়ই তার তীরে তীরে পাখীর খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম।

সেদিনও সেখানে গিয়ে দেখি স্রোতহীন নদীর জলে সাঁতার কাটছে একটি ধবধবে রাজহাঁস।

প্রশান্ত বললে, "ভাই, তুমি বন্দুক ছুঁড়োনা। আমি আজ রাজহংস শিকার করব।"

আমি বললুম, "হাঁসটা যদি কারুর পোষা হয়?"

প্রশান্ত বললে, "সেইজন্যেই তোমাকে বন্দুক ছুঁড়ে শব্দ করতে মানা করছি। আমার ধনুক কেমন নীরবে কার্য্যোদ্ধার করে দেখ।" ব'লেই সে বাগিয়ে ধরলে ধনুক।

ধনুক নীরবেই বাণ ত্যাগ করলে বটে, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই নদীর ওপার থেকে বিষম চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল একটা দিগম্বর ছেলে!

ধনুকের বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিদ্ধ করেছে সেই ছেলেটার একখানা হাতকে।

আমি বললুম, "সর্ব্বনাশ, করলে কি প্রশান্ত?"

প্রশান্ত বললে, "যা হবার হয়ে গেছে, আর কোন উপায় নেই। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে স'রে পড়ি এস!"

আমি দ্বিধাজড়িত-কণ্ঠে বললুম, "কিন্তু আমাদের কি এখন ঐ ছেলেটারই কাছে যাওয়া উচিত নয়?"

আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে প্রশান্ত বললে, "পাগল? মানুষ-শিকারের অপরাধে জেলে যেতে চাও নাকি?"

আমরা দ্রুতপদে মাঠের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে

লাগলুম। খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পিছনে শুনলুম মহা কোলাহল।

ফিরে দেখি, বিশ-পঁচিশজন লোক বেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তাদের অনেকের হাতে রয়েছে বড় বড় লাঠি।

প্রশান্ত দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "ওদের মাথার ওপর দিয়ে একবার কি দু'বার বন্দুক ছোঁড়ো তো! বন্দুকের ধমক শুনলে ওরা আর পালাবার পথ পাবে না!"

আমি বললুম, "মাপ করতে হ'ল! শেষটা টিপ ফস্‌কে যদি কারুর গায়ে গুলি লাগে? তুমি কি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাও?"

—"কিন্তু ওরা আমাদের ধরতে পারলে কি-রকম আদর করবে জানো?"

—"জানি। কিন্তু ওরা আমাদের ধরতে পারবে কেন? মারো দৌড়!"

মারলুম দৌড়: যে-সে দৌড় নয়, যাকে বলে রীতিমত ভোঁ-দৌড়! অত জোরে যে দৌড়তে পারি আমি নিজেই তা জানতুম না! হোঁচট্ খাই, বেদম হই, চোখে অন্ধকার দেখি,- তবু দৌড়, দৌড় আর দৌড়!

মাঠ পেরিয়ে পেলুম বন। বেপরোয়ার মত ঢুকে পড়লুম বনের ভিতরে। বন ক্রমেই নিবিড়, পদে পদে বাধা, বড় বড় গাছের পর গাছ, কাঁটাজঙ্গল, ঝোপঝাপ, আগাছায় ঢাকা ঢিপিঢাপা, পথের রেখা অদৃশ্য!

আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব! দেহের শক্তিও গেল ফুরিয়ে! একটা মস্ত গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রশান্ত ধপাস্ ক'রে বসে পড়ল, আমিও আসন নিলুম তার পাশে।

প্রশান্ত হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এখন স্বয়ং যম এলেও আমাকে এখান থেকে এক পা নড়াতে পারবে না।"

"আমি বললুম, "আপাতঃত যম বা মানুষ কেউ এখানে আসবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এস, আগে প্রাণ ভ'রে হাঁপ ছেড়ে নি।"

হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে করুণ চোখে দেখলুম, দেহের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। বারংবার ছোবল মেরে কাঁটা-ঝোপগুলো কেবল সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত ক'রেই দেয় নি, জামা-কাপড়েরও অনেক অংশ টেনে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়েছে এবং গাছে গাছে ধাক্কা ও উঁচু-নীচু জমিতে আছাড় খেয়ে দেহের সর্ব্বত্র পড়েছে বড় বড় কালশিরা। প্রশান্তেরও অবস্থা আমারই মত; উল্টে তার নাকটা এমনভাবে ফুলে উঠেছে যে তাকে আর নাক ব'লে চেনবার কোন উপায় নেই! আমার বন্দুকটা এখনো হাতছাড়া হয় নি, কিন্তু প্রশান্তের ধনুক-বাণ আর তার কাছে নেই।

সেইদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠল, "চুলোয় যাক্ ধনুক-বাণ! ঐ অলক্ষুণে ধনুক-

বাণের জন্যেই তো আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা ! আর কখনো ধনুক ধরব না !”

ঠিক সেই সময়েই আর এক কাণ্ড। খানিক তফাতে জঙ্গল হঠাৎ ন’ড়ে উঠল এবং তার পরেই একটা ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল এক চিতাবাঘ !

আমরা একেবারে আড়ষ্ট !

বাঘটাও আমাদের দেখে দস্তুরমত চম্‌কে উঠল এবং পরমূহূর্ত্তেই বিদ্যুৎ-বেগে লম্বা এক লাফ মেরে পাশের একটা বড় ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল !

আমি কম্পিত স্বরে বললুম, বন্ধু !”

—“উঁ !’

— “এখানে যম আসে নি বটে, কিন্তু যমদূত এসেছে !”

—“হুঁ।”

—“এখন কি করি ?”

—“বন্দুক ধর।”

—“পাখী-মারা বন্দুক ?”

—“তাও মন্দের ভালো ! বন্দুকটা ছোঁড়ো, বাঘের পিলে ভয়ে চম্‌কে যেতেও পারে।”

কিন্তু তারপরেই পিলে চম্‌কে গেল আমাদেরই ! আচম্বিতে আকাশ, বাতাস, জঙ্গল ও আমাদের বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে জেগে উঠল বাঘের গর্জ্জনের পর গর্জ্জন ! সামনের বড় ঝোপটার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত যেন বিষম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল !

আমরা একেবারে স্তম্ভিত ও হতভম্ব! প্রশান্তের কথায় বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছিলুম, কিন্তু অবশ হাত থেকে খ'সে বন্দুক প'ড়ে গেল মাটির ওপরে!

তারপরেই সভয়ে দেখলুম, বাঘটা আবার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এবং একটা হল্‌দে রঙের মূর্ত্তিমান ঝড়ের মত ছুটে আসতে লাগল আমাদেরই দিকে!

দারুণ আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে মাথার উপরকার গাছের ডাল ধ'রে ঝুলে পড়লুম এবং তারপর কোন-গতিকে দুই হাত ও দুই পায়ের সাহায্যে উঠে বসলুম ডালের উপরে।

বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। বাঘটা আবার অদৃশ্য হয়েছে এবং পাশের একটা ডাল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে বারংবার দুই পা ছুঁড়ছে প্রশান্ত।

শুক্‌নো গলায় বললুম, "শান্ত হও প্রশান্ত, বাঘ আর নেই।"

প্রশান্ত আমারই মত হাত ও পায়ের সাহায্যে তার ডালের উপরে উঠে বসল। তার মুখ তখন রক্তহীন।

বললুম,—"ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। বাঘটা—"

প্রশান্তের চোখদুটো আবার চম্‌কে হয়ে উঠল ছানাবড়ার মত। তার দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে আমার চোখও দেখলে আবার এক দৃশ্য!

বাঘটা এইমাত্র যে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তার ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে একটা মস্ত-বড় মোটাসোটা

বন্য বরাহ, তার মুখ ও গা রক্তাক্ত এবং পড়ন্ত রোদে চক্‌চক্‌ করছে তার দু'টো বড় বড় নিষ্ঠুর দাঁত !

বরাহটা একবার সগর্ব্বে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর পিছনের পাছু'টো মাটির উপর বার-কয়েক ঠুকে ধূলো উড়িয়ে ছুটে চ'লে গেল একদিকে।

প্রশান্ত বললে, "এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। বাঘটা আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে ঐ ঝোপটার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল। ওখানে গিয়ে দেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বরাহ-অবতার। তারপরেই সুরু ঝটাপটি। বরাহের দাঁতের খোঁচা খেয়ে ব্যাঘ্রের পলায়ন। বিজয়ী বরাহের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান!"

—"সবই তো বুঝলুম। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ বেলা আর বেশী নেই?"

—"দেখতে পাচ্ছি।"

—"এইবারে কি আমাদের ডাল ছেড়ে আবার ভূমিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়?"

—"পাগল?"

—"মানে?"

—"এইবারে আমি আরো-উঁচু ডালে গিয়ে উঠব।"

—"তারপর?"

—"তারপর আসুক সন্ধ্যা, আসুক রাত্রি, আসুক্‌ অন্ধকার, আমি আজ আর ভূতলে অবতীর্ণ হচ্ছি না।"

—"কি খাবে ?"

—"বাতাস।"

প্রশান্তের পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হ'ল।

সারারাত কেমন ক'রে কাটল এবং পরের দিন বাসায় ফিরে এসে মেশোমশাই ও মাসীমার কাছে যে অভ্যর্থনা লাভ করলুম সে-সব কথা আর কাগজে-কলমে প্রচার ক'রে লাভ নেই।

মেশোমশাই আমার হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন এবং প্রশান্তও আর কোনদিন ধনুক ধারণ করেছে ব'লে সন্দেহ হয় না।
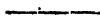
অলৌকিক

(নাটকের পোষাকে একটি অসম্ভব গল্প)

এক

[সুকোমলের বাড়ীর দোতালার কক্ষ। সুকোমলের স্ত্রী সুনীতি ব্যস্তভাবে একবার পথের দিকে জান্‌লার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে এসে হতাশ ভাবে চেয়ারের উপরে ব'সে পড়ছে। ঢং ঢং ক'রে যেই রাত এগারোটা বাজল, তখনি সুরু হ'ল আমাদের কাহিনী।]

সুনীতি॥ (চিন্তিত স্বরে) রাত এগারোটা! এখনো ইনি ফিরলেন না কেন? যে-পাষণ্ডের কাছে গিয়েছেন, আমার বড় ভয় করছে! (সিঁড়িতে পায়ের শব্দ) ঐ বুঝি তিনি আসছেন—না, না, ও তো ঠাকুরপোর পায়ের শব্দ!

(পরিমলের প্রবেশ)

পরিমল॥ বৌদি, দাদা এখনো ফেরেন নি?

সুনীতি॥ না ঠাকুরপো, আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি।

পরিমল॥ তাইতো, ভাবনারই কথা বটে! একবার তাঁর খোঁজে শঙ্কর উপাধ্যায়ের বাড়ী যাব নাকি?

সুনীতি॥ না ঠাকুরপো, আমি আর একলা থাকতে পারব না। তুমি তো থানায় গিয়েছিলে, পুলিশ কি বললে!

পরিমল ॥ পুলিশ ? তারা তো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে! বললে, 'এটা হচ্ছে ইংরেজ রাজ্যের রাজধানী, বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ্যে এখানে কোন অপার্থিব ভয়ঙ্করের আবির্ভাব হ'তে পারে না।' আমি বললুম, 'মশাই, আপনারা জানেন না, শঙ্কর উপাধ্যায় হচ্ছে প্রেতসিদ্ধ!' তারা তো হো হো ক'রে হেসেই অস্থির! বলে, 'পুলিশের কেতাবে প্রেত ব'লে কোন কথা নেই।' তারপর তাদের অনেক বোঝাবার আর কাকুতি-মিনতি করবার পর ইন্‌স্‌পেক্টার বললে, 'আচ্ছা, রাত বারোটার সময় আমি যখন রোঁদে বেরুব, তখন তোমাদের বাড়ীর কাছটা একবার ঘুরে আসব।'

স্নীতি ॥ ঠাকুরপো, এই শঙ্কর উপাধ্যায়কে তুমি কখনো দেখেছ ?

পরিমল ॥ দেখেছি বৈকি! বার-তিনেক দেখেছি।

স্নীতি ॥ কি-রকম তাকে দেখতে ?

পরিমল ॥ তাকেই তো বলা চলে মূর্ত্তিমান ভয়ঙ্কর।

স্নীতি ॥ (সভয়ে) ভয়ঙ্কর!

পরিমল ॥ হ্যাঁ বৌদি, মাথায় সে প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু। গায়ের রং তার অমাবস্যার অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। তার ঘন-কালো মুখের উপরে ভাঁটার মত গোল গোল চোখদুটো থেকে বেরোয় যেন অসহ আগুনের তীব্রতা! সে-চোখদুটোতে চোখ মিলিয়ে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব। তার কালো কপালের উপরে জ্বলতে থাকে উজ্জ্বল সিঁদূরের সুদীর্ঘ রেখা। পরণে

তার লাল-টক্‌টকে চেলির কাপড় আর উত্তরীয়। যখন সে কথা কয়, তখন তার হিংস্র বাঘের মত চক্‌চকে ক্রূর দাঁতগুলোর উপরে ফুটে ওঠে ক্ষুধিত নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত! ও-রকম দাঁত আর কোন মানুষের মুখে দেখিনি বৌদি! উঃ, ভয়াবহ!

সুনীতি॥ এত শক্তি হ'ল তার কেমন ক'রে?

পরিমল॥ তা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে লোকের মুখে তার অনেক কথাই শুনেছি। সে নাকি অনেক বার শব সাধনা করেছে। সে নাকি মহামাংসও খেয়েছে।

সুনীতি॥ মহামাংস! মহামাংস কি ঠাকুরপো?

পরিমল॥ কালীমূর্ত্তির সামনে নরবলি দিয়ে যে বলি-দেওয়া মাংস খাওয়া হয়।

সুনীতি॥ (শিউরে উঠে) বলো কি ঠাকুরপো, মানুষ কখনো মানুষের মাংস মুখে তুলতে পারে?

পরিমল॥ মানুষে পারে না, কিন্তু পিশাচে পারে। শঙ্কর উপাধ্যায়কে আমি সাক্ষাৎ নরপিশাচ ব'লেই মনে করি। সে সব ক'রতে পারে।

সুনীতি॥ কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বে নরবলি দেয় কেমন ক'রে?

পরিমল॥ বৌদি, ইংরেজ-রাজত্বে নরহত্যাও তো নিষিদ্ধ। তবু এখানে কি নিত্যই নরহত্যা হয় না? আর হত্যাকারী কি সর্ব্ব-সময়েই ধরা পড়ে? শঙ্কর উপাধ্যায় সত্যই যদি নরবলি দিয়ে থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে দেয়নি।

সুনীতি ॥ আচ্ছা ঠাকুরপো, শ্মশান-জাগানো, ভূত-প্রেত নামানো, শব সাধনা, এ-সব কি তুমি বিশ্বাস কর ?

পরিমল ॥ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

সুনীতি ॥ শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সত্যিই কি কেউ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয় ?

পরিমল ॥ ও-বিষয়েও আমার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। সবাই জানে, সাধক রামপ্রসাদ আর নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোনদিন অলৌকিক শক্তির খেলা দেখিয়েছেন ব'লে তো শুনিনি। ম্যাজিক দেখাবার জন্যে বা শয়তানি শক্তি অর্জ্জন করবার জন্যে কোন সাধু লোক শব-সাধনায় নিযুক্ত হয় না। শব-সাধনা হচ্ছে ধর্ম্মসাধনারই একটি অঙ্গ।

সুনীতি ॥ তবু শঙ্কর উপাধ্যায়কে তোমরা সাধু বল না কেন ?

পরিমল ॥ শব-সাধনায় ব'সে সে অর্জ্জন করেছে পশুশক্তি। সে ভগবানের বর চায়নি, চেয়েছে শয়তানের আশীর্ব্বাদ।

সুনীতি ॥ কিন্তু সে আমাদের কাছ থেকে কী চায় ?

পরিমল ॥ আমি জানি না। তুমিও কি জানো না ?

সুনীতি ॥ না।

পরিমল ॥ দাদা তোমায় বলেন নি ?

সুনীতি ॥ না। আমি তো আগে জানতুম, তোমাদের বোনের বিয়ের সময় উনি ঐ লোকটার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার করেছিলেন। সেই ধারের টাকা সুদে-আসলে বেড়ে

এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন-হাজার টাকায়। কিছু দিন আগে থেকেই সেই ধার শোধ করবার জন্যে শঙ্কর উপাধ্যায় তোমার দাদাকে রীতিমত চেপে ধরে। তোমার দাদা অনেক কষ্টে সব টাকা জোগাড় ক'রে ধার শোধ দিতে যান। কিন্তু শঙ্কর উপাধ্যায় এখন আর টাকা নিতে রাজি হচ্ছে না।

পরিমল॥ কেন ?

সুনীতি॥ কেন তা জানি না।

পরিমল॥ এ তো ভারি আশ্চর্য্য কথা। আর এ-জন্যে দাদাই বা এত ভয় পেয়েছেন কেন ? শঙ্কর যদি টাকা নিতে নারাজ হয় আর দাদার নামে নালিশ করে, তাহ'লে টাকা তো কোর্টে জমা দিলেই সব গোল মিটে যায়।

সুনীতি॥ তোমার দাদা বলেন সে নাকি কোর্টে নালিশ করতেও চায় না।

পরিমল। কি মুস্কিল, তবে কী চায় সে ?

সুনীতি। তোমার দাদাই জানেন।

পরিমল। এ-রহস্যের কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সুদে-আসলে সব টাকা ফিরিয়ে পেলে আর কী দাবি করবার অধিকার আছে তার ? তুমি কি এ-সম্বন্ধে দাদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করনি ?

সুনীতি। করেছিলুম বৈকি। কিন্তু তিনি কোন জবাব দেন না, বোবার মতন একেবারে চুপ ক'রে থাকেন।

পরিমল। দাদার এই নীরবতার কারণ কি ?

সুনীতি। তোমার দাদাই জানেন। তবে এইটুকু বুঝেছি, শঙ্কর এমন-কিছু চায় তোমার দাদার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ শঙ্কর বলছে তার ইচ্ছা পূর্ণ না করলে আমাদের বাড়ীতে সে পাঠিয়ে দেবে ভয়ঙ্করকে!

পরিমল। হুঁ, ভয়ঙ্কর! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কে? আমি তো ভয়ঙ্কর ব'লে মনে করি শঙ্কর উপাধ্যায়কেই।

সুনীতি। তাহ'লে শঙ্কর কি নিজেই আমাদের বাড়ীতে আসবে?

পরিমল। বৌদি, আমরা ভয় পাচ্ছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে এটাও মনে হচ্ছে, সে নিজে এখানে এসে কি করতে পারে? এখানে দাদা আছেন, আমি আছি, পাড়ার লোকজনরাও আছে—তার উপরে পুলিশের লোকও আসতে পারে! আমরা এতগুলো লোক মিলে কি ঐ একটা পাষণ্ডকেও দণ্ড দিতে পারব না? আমি অনেক দিন ধ'রে-লাঠি খেলা শিখেছি, আমি একলাই লাঠি মেরে শঙ্করের সমস্ত লম্ফঝম্প বন্ধ ক'রে দিতে পারি।

সুনীতি। না ঠাকুরপো, ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়! হয়তো কেবল শঙ্করের জন্যেই তোমার দাদা ভয় পাচ্ছেন না। তার দাবির পিছনে হয়তো লুকানো আছে অন্য কোন অর্থ।

পরিমল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গভীর কোন অর্থ! দাদা আমার দুর্ব্বলও নন্, কাপুরুষও নন্, তিনি হচ্ছেন ডাক্তার। আর

আমি মনে করি, হৃদয় যাদের সবল নয় ডাক্তারি পেশায় কোনদিনই তারা সফল হ'তে পারে না। তাইতো ভাবছি, দাদা যখন ভয়ে এমন কাতর হয়ে পড়েছেন, তখন এই রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে কোন ভয়ঙ্কর সংকেত।

সুনীতি। উনি তো এখনো এলেন না! আমার বুক যে কেমন করছে ঠাকুরপো, মনে হচ্ছে এখনি কি যেন একটা অঘটন ঘটবে!

পরিমল। কোন অঘটন ঘটবে না বৌদি, তুমি এখনি অতটা উতলা হয়ো না।

(সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ)

সুনীতি। (সানন্দে) ঐ উনি আসছেন—আঃ, বাঁচলুম!

(সুকোমলের প্রবেশ)

সুকোমল। (উত্তেজিত কণ্ঠে) সুনীতি, সুনীতি, সমস্তই ব্যর্থ হ'ল!

পরিমল। কি ব্যর্থ হ'ল দাদা?

সুকোমল। এত হাতে-পায়ে ধরা, এত অনুরোধ-উপরোধ! শঙ্কর উপাধ্যায় আমার কোন কথাই শুনবে না!

পরিমল। কেন শুনবে না দাদা? তুমি তো ধারের টাকা শোধ দিতেই গিয়েছিলে।

সুকোমল। সুধু ধারের টাকা নয় পরিমল, আমি তার পাওনা সুদের উপরেও আরো পাঁচশো টাকা বেশী দিতে চেয়েছিলুম।

পরিমল। (সবিস্ময়ে) তবু সে টাকা নিতে রাজি হ'ল না?

সুকোমল। না।

পরিমল। এমন কথাও তো কখনো শুনিনি!

সুকোমল। নোটের তাড়া সে আমার মুখের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

পরিমল। বেশ তো, সে যখন ইচ্ছে ক'রেই টাকা নিচ্ছে না, তখন তোমার আর দায়িত্ব কিসের?

সুকোমল। সে টাকা চায় না, তার বদলে চায় অন্য-কিছু।

পরিমল। তার দাবি যে কি, তাইই তো জানতে পারছি না। শুনছি, তুমি নাকি বৌদির কাছেও সে-কথা জানাও নি।

সুকোমল। (গম্ভীর স্বরে) সে জানাবার কথা নয় পরিমল।

পরিমল। তবে বল দাদা, তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ?

সুকোমল। পরিমল, দুরাত্মা শঙ্কর এমন-কিছু চায় আমার পক্ষে যা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব!

পরিমল। (অধীর স্বরে) কিন্তু সে কি চায় তাই বল না!

সুকোমল। (গম্ভীর স্বরে) সে চায় তোমার বৌদিদিকে!

পরিমল। (সগর্জ্জনে) কী?

সুনীতি। (আর্ত্তস্বরে) ওমা!

সুকোমল। শঙ্কর বলে,, তার সাধনার ব্যাঘাত হচ্ছে, বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধনায় নাকি ভৈরবীর দরকার হয়। সুনীতিকে সে চায় ভৈরবীরূপে গ্রহণ করতে।

পরিমল। অসম্ভব! অসম্ভব!

সুনীতি। আমি যাব না · আমি যাব না!

সুকোমল। শঙ্কর বলে, ভৈরবীরূপে সুনীতিকে মূর্ত্তিমতী দেবীজ্ঞানে পূজা করবে।

সুনীতি। (সকাতরে) আমি পূজা পেতে চাই না গো, আমি দেবী হ'তে চাই না।

সুকোমল। হ্যাঁ, সুনীতি, আমিও তোমাকে দেবী হ'তে বলছি না।

পরিমল। আমার বৌদিদি লক্ষ্মীরূপিনী মানবীর মত আমাদের ঘরেই বিরাজ করুন।

সুকোমল। কিন্তু শঙ্কর যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর ক'রে তোমার বৌদিদিকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে চায়।

পরিমল। (দৃপ্তস্বরে) আমার প্রাণ থাকতে নয়!

সুকোমল। আমিও তাই বলি পরিমল, আমাদের জীবন থাকতে নয়!

পরিমল। আমি পুলিশে খবর দিয়ে এসেছি দাদা! শঙ্কর কি জানে না, তার মতন দুরাত্মাকে বাধা দেবার জন্যে কলকাতায় আছে হাজার হাজার পুলিশের সেপাই?

সুকোমল। সে-কথা আমিও তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ত্রুটি করিনি। শুনে সে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল! বিকট সেই হাস্য!

পরিমল। সব দুরাত্মাই বিকট হাস্য করতে পারে দাদা, কিন্তু একবার পুলিশের হাতে পড়লে তাদের বিকট হাসি থেমে গিয়ে জেগে ওঠে কাতর কান্না! এখানে এসে শঙ্করকেও কাঁদতে হবে।

সুকোমল। কিন্তু শঙ্কর কি নিজে আসবে ব'লে মনে কর?

পরিমল। তবে?

সুকোমল। সে হয়তো পাঠিয়ে দেবে এক ভয়ঙ্করকে!

পরিমল। কে সেই ভয়ঙ্কর, আমি তাকে ভয় করি না!

সুকোমল। আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু শঙ্কর বলে, সে হচ্ছে এমন ভয়ঙ্কর,' আমরা কেউ তাকে কল্পনাতেও আনতে পারব না।

পরিমল। (সকৌতুকে হাসতে লাগল)

সুকোমল। ওকি, হঠাৎ অমন ক'রে হাসছ কেন?

পরিমল। (সহাস্যে) তোমার ছেলেমানুষি কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে দাদা! শঙ্করের ধাপ্পায় তুমিও কি নিজের বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে? থানায় যখন গিয়েছিলুম, পুলিশও তখন না হেসে পারেনি। এখন বুঝছি এই ভয়ঙ্করের কথাটা হাস্যকরই বটে!

সুকোমল। হাস্যকর ?

পরিমল। হাস্যকর নয়তো কি ? কল্পনায় মানুষ কুম্ভকর্ণের মতন মহাকায় দানব সৃষ্টি করে, আর শঙ্করের এমন কে ভয়ঙ্কর আসবে আমরা যাকে কল্পনাতেও আনতে পারব না ? সব বাজে কথা, একেবারে ধাপ্পাবাজি !

সুকোমল। পরিমল, শঙ্করের আস্তানায় গিয়ে আমি কি দেখেছি জানো ?

পরিমল। তুমি কি দেখেছ আমি তা কেমন ক'রে জানব ?

সুকোমল। শুনলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না !

পরিমল। বিশ্বাস করতে পারব না ? তাহ'লে তুমি কি নিজেই সেই ভয়ঙ্করকে দেখে এসেছ ?

সুকোমল। না, ভয়ঙ্কর নয়।

পরিমল। তবে ?

সুকোমল॥ (সভয়ে শিহরিত স্বরে) সে-কথা বলতে গিয়ে এখনো আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে !

সুনীতি॥ ওগো, ওগো, তুমি কী দেখেছ ?

সুকোমল॥ কল্পনার অতীত এক মূর্ত্তিমান বীভৎসতা !

পরিমল॥ দাদা, দাদা, যা বলবার তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলো !

সুকোমল॥ শঙ্কর আমাকে তার পূজার ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরটাও যেন পৃথিবী-ছাড়া, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেও মনে হয় যেন উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ঘরের সমস্ত বর্ণনা এখন আমি করব না, তবে এইটুকু শুনে রাখো, তার চার কোণে

দাঁড়িয়ে আছে চারটে নর-কঙ্কাল, আর একদিকে মানুষের হাড়ের বেদীর উপরে দাঁড় করানো রয়েছে, এক প্রকাণ্ড অতি-কুৎসিত অনার্য্য দেবতার ভীষণ মূর্ত্তি সাঁওতালিরা যে রকম সব অপদেবতার মূর্ত্তি পূজা করে, এ-মূর্ত্তিটাও অনেকটা সেই রকম দেখতে। ঘরের মাঝখানে পাতা রয়েছে চারিদিকে মড়ার মুণ্ডু দিয়ে সাজানো ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনের উপরে আর একটা মূর্ত্তি!

পরিমল॥ সে কিসের মূর্ত্তি?

স্থকোমল॥ মানুষের!

পরিমল॥ তবে তার কথা বলতে গিয়ে তোমার গলার আওয়াজ এত কাঁপছে কেন?

স্থকোমল॥ (অভিভূত কণ্ঠে) হ্যাঁ, সে মানুষের মূর্ত্তি পরিমল, সে মানুষেরই মূর্ত্তি! কিন্তু সে জীবিত নয়!

পরিমল॥ শঙ্কর বুঝি কোথা থেকে একটা মড়া জোগাড় ক'রে এনে তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে? কিন্তু দাদা, নিজের হাতে তুমি তো কত মড়া কেটেছ, তবু তুমি ভয় পেয়েছ একটা তুচ্ছ মড়া দেখে? তোমার কথা শুনে আবার আমার হাসি আসছে দাদা!

স্থকোমল॥ (বিকৃত স্বরে) হেসোনা পরিমল, হেসো না! সেটা মড়া নয়!

পরিমল॥ (সবিস্ময়ে) তুমি যে কি বলতে চাও দাদা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

সুনীতি॥ (চিন্তিত স্বরে) ওগো চলো, বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবে চলো।

সুকোমল॥ (শুষ্ক হাস্য ক'রে) হ্যাঁ, বিশ্রামই করব বটে! না পরিমল, তোমার দাদা এখনো পাগল হয়নি। ব্যাঘ্রাসনের উপরে যে বসেছিল সে মরা মানুষ নয়! সে চোখ মুদে ছিল, আমার প্যায়ের শব্দ শুনেই দুই চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে! কী অস্বাভাবিক সেই দৃষ্টি! সে-দৃষ্টি যেন আমার দেহ ভেদ ক'রে ঘরের দেওয়াল ভেদ ক'রে চ'লে গেল কোন্ দূর, দূরান্তরে, কোন্ সীমাহীন শূণ্যতার দিকে! শঙ্কর তাকে সম্বোধন ক'রে বললে, 'ঘরের ভিতরে কে এসেছে দেখতে পাচ্ছ?' মূর্ত্তির ওষ্ঠাধর ন'ড়ে উঠল, তারপর যেন তার উদরের তলদেশ থেকে গম্ভীর, ভয়াল একটা স্বর বেরিয়ে এল, সে বললে, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' শঙ্কর আমার দিকে ফিরে বললে, 'সুকোমল, তুমি তো চোখেও দেখলে আর কানেও শুনলে, এই লোকটি তাকিয়ে আছে আর কথাও কইছে! এইবারে তুমি ওর গায়ে হাত দাও দেখি।' আমি তার গায়ে হাত দিলুম—উঃ! তারপরে পরিমল, তারপরে চমকে উঠে হাতখানা আবার সরিয়ে আনলুম!

পরিমল॥ (সাগ্রহে) কেন, কেন?

সুকোমল॥ তার গা কনকন করছে ঠাণ্ডা দুদিনের বাসি মড়ারও গা অতটা অসম্ভব ঠাণ্ডা হয় না! আমার চমকানি দেখে শঙ্কর হেসে উঠে আবার বললে, 'সুকোমল, তুমি তো

ডাক্তার। একবার ঐ লোকটার বক্ষ পরীক্ষা ক'রে দেখ দেখি! আমি তার কথামত কাজ করলুম। (চীৎকার ক'রে) পরিমল, তার বুক একেবারে স্থির, তার হৃৎপিণ্ডে এতটুকু স্পন্দন নেই! তারপর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখলুম, তার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই নেই! সে একটা মৃতদেহই বটে, কিন্তু সে কথা কয়, শুনতে পায়, চোখ মেলে তাকায়!

পরিমল॥ তোমার ভুল হয়নি দাদা?

সুকোমল॥ অসম্ভব! আমি সাধারণ লোক নই, আমি ডাক্তার, আজ বারো বছর ধ'রে ডাক্তারি করছি।

সুনীতি॥ (আড়ষ্ট স্বরে) তারপর?

সুকোমল॥ স্তম্ভিতের মত ব'সে আছি, শঙ্কর আবার আমাকে ডেকে বললে, 'তুমি আমার শক্তি স্বচক্ষে দেখলে তো? শুনে রাখো, আমার ভয়ঙ্কর এরও চেয়ে ভয়াবহ! এখন তুমি আমার কথায় রাজি হবে?' আমি তখনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে তাকে বললুম, 'আমি ভোজবাজি দেখে ভয় পাই না শঙ্কর, তোমার কথায় এ-জীবনে আমি রাজি হ'ব না!' শঙ্কর পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'তাহ'লে প্রস্তুত থেকো? রাত বারোটার পরেই আমার ভয়ঙ্কর তোমার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবে!' আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না, তাড়াতাড়ি সেই নরকের বাইরে চ'লে এলুম।

সুনীতি॥ (সভয়ে) রাত বারোটা! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ গো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ!

পরিমল ॥ (সচমকে) রাত বারোটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি !

সুকোমল ॥ (উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে) আমি এখন কি করি পরিমল —আমি এখন কি করি সুনীতি ? এখনি মনে হচ্ছে আমার সারা বাড়ীখানা কি এক অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ! পরিমল, পরিমল, তোমার স্ত্রী কোথায়, বৌমা ?

পরিমল ॥ কমলা এখন ঘুমিয়ে আছে ।

সুনীতি ॥ বারোটা বাজতে আট মিনিট বাকি ! (সকাতরে) ওগো, কি হবে গো ?

(হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্ত্তনাদ ভেসে এল)—

সুকোমল ॥ (চমকে উঠে) ওযে বৌমার গলা !

পরিমল ॥ (উচ্চস্বরে) কমলা—কমলা—কমলা ! (দ্রুতপদে প্রস্থান)

—(আবার সেই আর্ত্তনাদ—এবারে আরো তীব্র !)

সুনীতি ॥ (ঘরের বাহির থেকে) দাদা, দাদা !

সুকোমল ॥ যাই পরিমল, যাই !

(স্ত্রী-কণ্ঠে আবার আর্ত্তনাদ !) [সুকোমলের বাড়ীর তিনতালায় পরিমলের ঘর । কমলা ঘরের এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে । তার মুখে-চোখে দারুণ ভয়ের ভাব ।]

পরিমল ॥ (বেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে) কমলা !

কমলা ॥ (ভীতিবিহ্বল বদ্ধ কণ্ঠে) ওগো ! (কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপরে ব'সে পড়ল)

পরিমল ॥ (কমলার কাছে গিয়ে নিজের দুই হাতে তার দুই হাত ধরে) কমলা, তুমি চীৎকার ক'রে কাঁদছিলে কেন ? এখনো তুমি এত কাঁপছ কেন ?

কমলা ॥ (সেই-রকম বদ্ধ কণ্ঠে) সে চ'লে গেছে ?

পরিমল ॥ কে চ'লে গেছে কমলা ?

কমলা ॥ সেই মূর্ত্তিটা ?

পরিমল ॥ (সবিস্ময়ে) মূর্ত্তি ? মূর্ত্তি আবার কি ?

কমলা ॥ পিশাচ !

পরিমল ॥ তুমি এ-সব কী বলছ ?

কমলা ॥ রাক্ষস !

পরিমল ॥ মূর্ত্তি পিশাচ—রাক্ষস, স্বপ্নে কিছু দেখে ভয় পেয়ে তুমি কি প্রলাপ বকছ ?

কমলা ॥ না গো না, আমি ঘুমোই নি, আমি স্বপ্ন দেখিনি, আমি জেগে জেগেই দেখেছি সেই মূর্ত্তিটাকে !

সুকোমল ॥ (ঘরের বাহিরে তার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল) কে ? কে ? সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছ কে তুমি ? সাড়া দিচ্ছ না যে ? চোর না কি ? দাঁড়াও, দেখছি !

কমলা ॥ ঐ শোনো ! তোমার দাদাও তাকে দেখতে পেয়েছেন !

পরিমল ॥ কাকে দেখতে পেয়েছেন ?

কমলা ॥ সেই পিশাচটাকে !

পরিমল ॥ কে পিশাচ ?

কমলা ॥ জানি না ! মানুষের মূর্তি, কিন্তু সে মানুষ নয় !

পরিমল ॥ মানুষের মূর্তি, মানুষ ছাড়া আর কী হ'তে পারে ?

সুকোমল ॥ (ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে) আশ্চর্য !

পরিমল ॥ কি আশ্চর্য দাদা ?

সুকোমল ॥ পায়ের শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে কে নেমে গেল নীচের দিকে ! কিন্তু নীচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না ! অথচ সদর দরজাটা খোলা রয়েছে ! চ'লেই বা গেল কে, আর দরজাই বা খুললে কে ? আমার বেশ মনে আছে, বাড়ীর ভিতরে ঢুকে নিজের হাতে আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম ! কে এল, কে গেল, কে দরজা খুললে ?

কমলা ॥ সেই মূর্তি ! আমি তাকে দেখেছি !

সুকোমল ॥ তুমি কাকে দেখছ বৌমা ?

কমলা ॥ একটা অমানুষের মূর্তিকে ! আমি বিছানায় শুয়েছিলুম, হঠাৎ ঘরের ভিতরটা ভ'রে গেল পচা মাংসের গন্ধে ! অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি, আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীষণ একটা মূর্তি ! আমার মুখের পানে স্থির চোখে সে তাকিয়ে ছিল, আমি চীৎকার ক'রে উঠতেই ঘরের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল ।

[বাইরে রাস্তা থেকে কে উচ্চস্বরে ব'লে উঠল,—'এই সেপাই ! পাক্‌ড়ো উস্‌কো !']

পরিমল ॥ রাস্তায় আবার কি কাণ্ড হচ্ছে ! (ছুটে জানালার কাছে গিয়ে) কিছু দেখা যায় না, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ! কেবল শোনা যাচ্ছে ছুটোছুটির শব্দ !

[রাস্তা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'এটা কি সুকোমলবাবুর বাড়ী ?']

সুকোমল ॥ (চম্‌কে উঠে) কে ডাকে ?

পরিমল ॥ বোধ হয় অবনীবাবু এসেছেন।

সুকোমল ॥ অবনীবাবু কে ?

পরিমল ॥ থানার ইন্‌স্‌পেক্টার ! চলো, আমরা নীচে নেমে যাই !

সুকোমল ॥ হ্যাঁ, চলো চলো ! বাড়ীর ভিতরে থাকতে আমার ভয় করছে !

[রাস্তা। সুকোমলের বাড়ীর সম্মুখভাগ। ইন্‌স্‌পেক্টার অবনীবাবু কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। সুকোমল ও পরিমল বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের উপরে এসে দাঁড়াল।]

অবনী॥ (টর্চ্চের আলো জ্বেলে) এই যে পরিমলবাবু! আপনার সঙ্গে উনি কে?

পরিমল॥ আমার দাদা।

অবনী॥ এইমাত্র আপনাদের বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল কে?

পরিমল॥ জানি না।

অবনী॥ জানেন না?

পরিমল॥ না, আমি কারুকে দেখিনি। আপনি যাকে দেখেছেন, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক?

অবনী॥ পুরুষ।

পরিমল॥ আমাদের বাড়ীতে আমরা দু'জন ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই।

অবনী॥ কিন্তু আমি যে তাকে স্বচক্ষে দেখেছি! আমি—

সুকোমল॥ (সভয়ে) ইন্সপেক্টারবাবু, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন?

অবনী॥ পাচ্ছি।

সুকোমল॥ পচা মড়ার দুর্গন্ধ!

অবনী॥ ঠিক বলেছেন! এতক্ষণ ও-কথাটা আমার মনে হয়নি। কিন্তু এ কিসের দুর্গন্ধ?

সুকোমল॥ আমার বোধহয়, যে গেল তার গায়ের গন্ধ।

অবনী॥ কী বলছেন! জ্যান্তো মানুষের গায়ে মড়ার দুর্গন্ধ?

সুকোমল ॥ ঠিক তাই।

অবনী ॥ কি ক'রে জানলেন আপনি ?

সুকোমল ॥ অনুমান করছি।

অবনী ॥ এমন অদ্ভুত অনুমানের কারণ ?

সুকোমল ॥ বোধহয় এইমাত্র এখানে যার আবির্ভাব হয়েছিল, খানিক আগে তাকেই আমি দেখেছি শঙ্কর উপাধ্যায়ের বাড়ীতে।

অবনী ॥ কে সে ?

সুকোমল ॥ (শিউরে) জ্যান্তো মড়া !

অবনী ॥ কি, কি বললেন ?

সুকোমল। জীবন্ত মৃতদেহ !

অবনী ॥ পরিমলবাবু, আপনার দাদার মাথা খারাপ নয় তো ?

সুকোমল ॥ (শুকনো হাসি হেসে) আপনিও সেই সন্দেহ করছেন ? না, আমার মাথা এখনো খারাপ হয়নি ইন্স্পেক্টার-বাবু, তবে মাথা খারাপ হ'তে আর বেশীক্ষণ লাগবে না বোধহয়। হ্যাঁ, যা বলছি, সত্যকথা ! শঙ্কর উপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়ে আমি একটা মৃতদেহ দেখেছি, কিন্তু জীবন্ত মৃতদেহ !

অবনী ॥ আপনার কথার কোনই মানে হয় না। যা জীবন্ত, তাকে মৃতদেহ বলা চলে না।

সুকোমল ॥ তা চলে না। তবু ঐ কথাই আমি বলতে চাই। আমার বিশ্বাস, আপনিও আজ তাকেই দেখেছেন।

অবনী ॥ (দৃঢ় স্বরে) না, আমি দেখেছি একজন জীবন্ত মানুষকে।

সুকোমল ॥ তাকে কি-রকম দেখতে বলুন দেখি?

অবনী ॥ ঐখানেই একটু মুস্কিল আছে। আমি তার মুখ দেখতে পাইনি—দেখেছি তার পিছনদিকটা। তবে তার হাব-ভাব, চলা-ফেরা আমার কাছে সন্দেহজনক ব'লে মনে হয়েছিল। তাই তাকে দাঁড়াতে বললুম, কিন্তু সে আমার কথা না শুনে কলে-চলা পুতুলের মত হনহন ক'রে এগিয়ে চ'লে গেল। পাহারাওয়ালাদের তাকে ধ'রে আনতে বললুম, কিন্তু সে ঐ সরু গলিটার ভিতর ঢুকে প'ড়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল বলতে পারি না।

সুকোমল। আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে, আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে যে শঙ্কর উপাধ্যায় আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে সেই মৃতদেহটাকেই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল! আর—

অবনী ॥ (বাধা দিয়ে অধীর স্বরে) থামুন মশাই, থামুন! বারবার একটা বাজে কথা ব'লে আমাকে ত্যক্ত করবেন না! জ্যান্তো মড়া! যা নয় তাই!

সুকোমল ॥ আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, আমি নাচার! শঙ্কর উপাধ্যায়কে আপনি চেনেন না, তাই এই কথা বলছেন।

অবনী ॥ রাখুন আপনার শঙ্কর উপাধ্যায়! দুনিয়ায় আমি অনেক শর্ম্মাকেই ঠাণ্ডা করেছি।

পরিমল ॥ ইন্স্পেক্টার মশাই, আপনি আমার দাদার কথা 'উড়িয়ে দিতে চাইছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু আছে।

অবনী ॥ আমি পুলিশ, অলৌকিক ঘটনা মানি না।

পরিমল ॥ আজ কি হয়েছে জানেন?

অবনী ॥ কি?

পরিমল ॥ আমাদের বাড়ীর সদর দরজা যে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিটা বাহির থেকে আশ্চর্য্য উপায়ে দরজা খুলে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

অবনী ॥ এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? অনেক কৌশলী চোরও বাহির থেকে দরজা খোলবার উপায় জানে! আপনাদের বাড়ীতে চোর এসেছিল, সকলের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

পরিমল ॥ তারপর শুনুন, আমরা তাকে দেখিনি বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী স্বচক্ষে তাকে দেখেছেন। তিনি কি বলেন জানেন?

অবনী ॥ কি বলেন?

পরিমল ॥ তিনি বলেন তাকে দেখতে পিশাচের মত, রাক্ষসের মত! তিনি বলেন, যাকে দেখেছেন তার মানুষের মূর্ত্তি, কিন্তু সে মানুষ নয়!

অবনী ॥ (বিরক্ত স্বরে) রাবিশ! আমি এখন 'ডিউটি'তে

আছে। এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের রূপকথা শুনে সময় নষ্ট করতে চাই না। (প্রস্থান করতে উদ্যত হ'লেন)

সুকোমল॥ (কাতর স্বরে) যাবেন না ইন্স্‌পেক্টার মশাই, আমাদের ফেলে চ'লে যাবেন না!

অবনী॥ আচ্ছা মুস্কিল তো! আমার কি আর কোন কর্ত্তব্য নেই? এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে আমাকে কি পাগলের প্রলাপ শুনতে হবে?

সুকোমল॥ শঙ্কর উপাধ্যায় বলেছে, আজ রাত বারোটার সময় ঐ জ্যান্তো মড়াটার চেয়েও সাংঘাতিক কোন্ ভয়ঙ্করকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে।

অবনী॥ (হা হা ক'রে হেসে উঠে) জ্যান্তো মড়ার উপরেও আরো কিছু আছে নাকি? তা'হলে বোধহয়, শঙ্কর উপাধ্যায়ের হুকুমে জড় হিমালয় পর্ব্বত আজ জ্যান্তো হয়ে আপনাদের বাড়ীর উপরে এসে ভেঙে পড়বে! কি বলেন? (আবার কৌতুকহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন)

পরিমল॥ (সভয়ে দাদা, দাদা! চেয়ে দেখ, ঐদিকে চেয়ে দেখ! ঐ গলির ভিতর থেকে সাদা-মতন কি-একটা এদিকে আসছে না?

অবনী॥ (তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ, কেউ আসছে বটে! মাঝে মাঝে 'টর্চ্চ' জ্বেলে পথ দেখছে। সে লোকটাও ঐ গলির ভিতরেই ঢুকে গিয়েছিল, কিন্তু তার হাতে 'টর্চ্চ ছিল না। এ অন্য-কোন লোক।

[সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।]

অবনী॥ (আগন্তুকের দিকে 'টর্চ্চে'র আলো নিক্ষেপ ক'রে) কে আপনি ?

আগন্তুক॥ (সহাস্যে) পথিক।

অবনী॥ এত রাত্রে কোথা থেকে আসছেন ?

আগন্তুক॥ বিয়ে-বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছি।

অবনী॥ আপনার নাম কি ? কোথায় থাকেন ?

আগন্তুক॥ আমার নাম হরিহর চৌধুরী। থাকি জোড়াসাঁকোয়।

অবনী॥ দেখলুম আপনি ঐ গলির ভিতর থেকে বাইরে এলেন। ওখানে আর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?

হরিহর॥ (রহস্যময় হাসি হেসে) হয়েছিল।

অবনী॥ তার মুখ দেখেছেন ? আবার তাকে দেখলে চিনতে পারবেন ?

হরিহর॥ (আবার সেই-রকম হাসি হেসে) তার মুখ দেখেছি। পায়ের শব্দ শুনে 'টর্চ্চে'র আলো জ্বেলেই দেখলুম, গলির ভিতরে পচা মড়ার গন্ধ ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে একটা অদ্ভুত মূর্ত্তি !

অবনী॥ অদ্ভুত মূর্ত্তি ?

হরিহর॥ হ্যাঁ। অদ্ভুত মূর্ত্তি, কারণ সে হচ্ছে একটা চলন্ত মৃতদেহ !

অবনী॥ (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) এতক্ষণ শুনছিলুম জীবন্ত মৃতদেহ, এখন আবার শুনছি চলন্ত মৃতদেহের কথা! আজ কি সকলেই ক্ষেপে গিয়েছে!

হরিহর॥ আপনাকে পুলিশ-কর্ম্মচারী ব'লে মনে হচ্ছে। পৃথিবীর অপরাধীদের নিয়েই আপনাদের কারবার, কিন্তু এই সাধারণ পৃথিবীর ভিতরেই যে সব অসাধারণ রহস্য আছে, আপনারা তার কতটুকু খবর রাখেন?

অবনী॥ আপনি দেখছি সুকোমলবাবুর চেয়েও আর এক পর্দ্দা উপরে উঠে কথা কইছেন! সাধারণ পৃথিবীর অসাধারণ রহস্যের কথা আপনি আমার চেয়ে ভালো ক'রে জানলেন কেমন ক'রে?

হরিহর॥ প্রেততত্ত্ববিদ ব'লে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে।

সুকোমল॥ (তাড়াতাড়ি এগিয়ে) আপনিই কি সেই বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ হরিহরবাবু?

অবনী (হাস্য ক'রে) তাহ'লে আপনার নাম আমারও অপরিচিত নয়। শুনেছি আপনি ইহলোকে ব'সেই পরলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। কিন্তু আমি মশাই, ও সব কথায় একটুও বিশ্বাস করি না।

হরিহর॥ আপনি বিশ্বাস না করলেও ইহলোকের বা পরলোকের কোনই ইষ্ট বা অনিষ্ট হবে না।

সুকোমল॥ (ব্যস্তভাবে) হরিহরবাবু, হরিহরবাবু! আপনার কাছে আমি গোটা-কয়েক কথা নিবেদন করতে পারি কি?

হরিহর ॥ অনায়াসেই।

সুকোমল ॥ তাহ'লে দয়া ক'রে এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন। [হরিহরকে নিয়ে সুকোমল খানিকটা তফাতে গিয়ে মৃদুস্বরে কি বলতে লাগল, শোনা গেল না।]

অবনী ॥ পরিমলবাবু, আপনাদের এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমিও ক্ষেপে যাব ব'লে মনে হচ্ছে। কৈ, এখনো তো কোন ভয়ঙ্করেরই আবির্ভাব হ'ল না! ও-সব বাজে ভয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আমি এখন চললুম।

পরিমল ॥ ইন্স্পেক্টার মশাই, দয়া ক'রে আর একটু অপেক্ষা করুন।

অবনী ॥ আমি হচ্ছি পুলিশের লোক, রোজা নই। ভৌতিক কাণ্ড-কারখানার ভিতরে আমি থাকতে ইচ্ছা করি না।

পরিমল ॥ আপনাদের পেয়ে আমরা অকূলে কূল পেয়েছি। আর মিনিট কয়েকের জন্যে এখানে অপেক্ষা করলে বোধহয় আপনার কাজের কোনই ক্ষতি হবে না।

অবনী ॥ (নাচার ভাবে) আপনারা জ্বালালেন দেখছি! [মিনিট-পাঁচেক কেটে গেল। হরিহর ও সুকোমল আবার এদিকে অগ্রসর হয়ে এল।]

হরিহর ॥ সুকোমলবাবু, আপনার ব্যাপারটা বিশেষ জটিল ব'লে বোধ হচ্ছে না। যদিও এ-রকম ঘটনার মধ্যে এর আগে আমি নিজে কখনো এসে পড়িনি, তাহ'লেও আমার গুরুদেব সত্যশিবসুন্দর স্বামীজির কাছ থেকে শুনেছি, এমন-সব

ঘটনা ঘটাও কিছুই অসম্ভব নয়। বামাচারীরা নিম্নশ্রেণীর সাধক বটে, কিন্তু তারা এমন-সব অদ্ভুত শক্তি অর্জ্জন করে যা আমরা অনায়াসেই অপার্থিব ব'লে মনে করতে পারি। এমন কি, একান্ত ভাবে ধ্যানের দ্বারা আর মন্ত্রগুণে তারা অতিকায় দানব পর্য্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে আমার বিশ্বাস, আপনাদের ঐ শঙ্কর উপাধ্যায় আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে হয়তো ঐ-রকম কোন একটা মূর্ত্তি এখানে প্রেরণ করতে চায়। সত্যিসত্যিই সে মূর্ত্তি হচ্ছে অসীম শক্তিশালী আর কল্পনাতীত রূপে ভয়ঙ্কর, যার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমাদের এই ইন্স্পেক্টার মশাইয়ের একাধিক রিভলভার আর পাহারাওয়ালাদের শতাধিক রুলের গুঁতো পর্য্যন্ত একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অবনী॥ মশাই, আপনি দেখছি সকলের ওপরে টেক্কা মারলেন! আপনার মতন উন্মত্ত মানুষ পৃথিবীর সব-চেয়ে বড় পাগলাগারদে গেলেও আবিষ্কার করা অসম্ভব।

হরিহর॥ (সহাস্যে ও বিনীত ভাবে) আপনার এই অভিনন্দন আমি সাদরে গ্রহণ করলুম। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। রাখবেন কি?

অবনী॥ কি অনুরোধ?

হরিহর॥ দয়া ক'রে যদি এখানে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তাহ'লে কল্পনাতীত অলৌকিক ঘটনাও যে এই সাধারণ পৃথিবীতে সম্ভবপর হয়, সেইটেই আপনার চোখের সামনে প্রমাণিত ক'রে দেব

অবনী॥ কথায় বলে—'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' বেশ, আপনারা ভৌতিক ধাপ্পাবাজির আয়োজন যখন করেছেন, তখন তার শেষ পর্য্যন্তই দেখা যাক। 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখা যাক্ পাতাল কতদূর!'

হরিহর॥ সুকোমলবাবু, ইন্‌স্‌পেক্টার মশাই এখনো অবিশ্বাসী। সুতরাং ওঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আসুন, এখন আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করি।

সুকোমল॥ আমার যে কি কর্ত্তব্য আমি তা নিজেই বুঝতে পারছি না।

হরিহর॥ আমার অনুরোধে রক্ষা করলেই আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করা হবে।

সুকোমল॥ আদেশ করুন।

হরিহর॥ আদেশ নয়, অনুরোধ।

সুকোমল॥ বলুন।

হরিহর॥ আমার অনুরোধ হচ্ছে, আপনারা সকলে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করুন।

অবনী॥ (ব্যঙ্গসূচক ভ্রূভঙ্গি ক'রে) তারপর?

হরিহর॥ তারপর? তারপর আপনাদের আর বিশেষ কিছুই করতে হবে না, কারণ তারপর আপনারা অধিকার করবেন কেবল দর্শকের আসন।

অবনী॥ আর আপনি? তারপর অভিনেতা হবেন কি আপনি?

হরিহর ॥ মোটেই নয়। এই বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যাভিনয়ের জন্যে আমি কেবল রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত ক'রে রাখতে চাই।

অবনী ॥ তার মানে ?

হরিহর ॥ মানে আপনি কিছুই বুঝবেন না, কারণ আপনি এখনো পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী।

অবনী ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) আমি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী তা নিয়ে বাজে কথা খরচ করবেন না! আমি জানতে চাই, আপনি এখানে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবেন ?

হরিহর ॥ আমি ? আমি আগে এই বাড়ীখানার চারিদিকে মন্ত্রঃপূত রেখা টেনে দিতে চাই !

অবনী ॥ কেন ?

হরিহর ॥ ভয়াবহ অমঙ্গলের কবল থেকে আপনাদের রক্ষা করার জন্যে।

অবনী ॥ (ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে) তাই নাকি ?

হরিহর ॥ (তপ্ত কণ্ঠে) হাঁ, তাই! আপনার ঐ অজ্ঞতা আর মূর্খতা দিয়ে বারবার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না! আমি বুঝতে পারছি, আর সময় নেই! মনে মনে আমি শুনতে পাচ্ছি, এমন কোন ভয়ঙ্কর পৃথিবীর মাটির উপর তার অপার্থিব মূর্ত্তি নিয়ে এইদিকে ধেয়ে আসছে, যার কবলে পড়লে আপনাদের তুচ্ছ অস্তিত্ব এখনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে! (আদেশের স্বরে) যান, যদি প্রাণে বাঁচতে চান, অবিলম্বে ঐ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করুন!

[অকস্মাৎ হরিহরের মূর্ত্তির এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হ'ল। তাঁর গাম্ভীর্য্য ও সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে সকলেরই মন হয়ে উঠল সচকিত। সকলে - এমন কি ইন্স্‌পেক্টার অবনী পর্য্যন্ত আর কোন কথা বলতে সাহস না পেয়ে মাথা নত ক'রে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলে।]

চার

[সুকোমলের বাড়ীর দোতালার বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুকোমল, পরিমল ও অবনীবাবুর সঙ্গে হরিহর। তাদের সকলেরই দৃষ্টি নীচেকার রাস্তার দিকে।]

অবনী ॥ অন্ধকারের ভিতরে যেন দুটো চলন্ত মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে না ?

হরিহর ॥ হ্যাঁ। মূর্ত্তিদুটো এইবারে এই বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

[অবনী সেইদিকে টর্চ্চের আলোক নিক্ষেপ করলে।]

সুকোমল ॥ (সভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল)

অবনী ॥ অমন ক'রে উঠলেন কেন সুকোমলবাবু ?

সুকোমল ॥ (অভিভূত স্বরে) ও যে সেই !

অবনী॥ কে?

সুকোমল॥ সেই জীবন্ত মৃতদেহটা!

হরিহর॥ অমন আড়ষ্ট ভাবে তাকিয়ে কি দেখছেন ইন্সপেক্টার মশাই? আমিও টর্চ জ্বালি, ডবল টর্চের আলোয় আপনি আরো ভালো ক'রে ঐ মূর্ত্তিটাকে দেখুন ও চলছে আর নড়ছে বটে, কিন্তু ওকে কি জ্যান্তো মানুষ ব'লে মনে হয়?

অবনী॥ (খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন থেকে) একী দেখছি!

সুকোমল॥ (উত্তেজিত কণ্ঠে) ঐ অসম্ভব মূর্ত্তিটা এবারে একলা আসেনি, ওর সঙ্গে এসেছে শঙ্কর উপাধ্যায় নিজেও!

শঙ্কর॥ (হা হা স্বরে উচ্চহাস্য ক'রে) হ্যাঁ সুকোমল, এবার আমিও তোমার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি!

অবনী॥ কে তুমি? কী চাও এখানে?

শঙ্কর॥ (আবার বিকট হাস্য ক'রে) আমি যা চাই সুকোমল তা জানে!

অবনী॥ আমি এখনি তোমাকে আর তোমার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করব!

শঙ্কর॥ তাই নাকি? হা হা হা হা হা! তুচ্ছ জীব, আমাকে গ্রেপ্তার করবে তুমি?

অবনী॥ (ক্রোধে চীৎকার ক'রে পাহারাওয়ালাদের উদ্দেশে) সেপাই! এই সেপাই! তোমরা—

হরিহর ॥ (বাধা দিয়ে) শান্ত হোন্। পাহারাওয়ালাদের ডাকছেন কেন?

অবনী ॥ ঐ দুটো বদমাইস্‌কে ধ'রে আনবে ব'লে। মারের চোটে ওদের হাড় গুড়ো ক'রে দেব।

হরিহর ॥ এখন এ-বাড়ী থেকে জনপ্রাণীর রাস্তায় বেরুনো উচিত নয়।

অবনী ॥ আপনার ও-কথা আমি মানব না! আগে ওদের গ্রেপ্তার করি, তারপর অন্য কথা।

হরিহর ॥ কিন্তু কাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন? চেয়ে দেখুন, ওরা আবার অন্ধকার-সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে!

অবনী ॥ কিন্তু তলিয়ে ওরা যাবে কোথায়? এখনো ওরা বেশী দূরে যেতে পারেনি। (চীৎকার ক'রে) সেপাই! সেপাই!

হরিহর ॥ চুপ করুন। আরো দূরে তাকিয়ে দেখুন।

অবনী ॥ (তীক্ষ্ণ নেত্রে দেখবার চেষ্টা ক'রে) কই, কি দেখব? দেখছি তো খালি অন্ধকার!

হরিহর ॥ অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারের চেয়েও কালো আর একটা বিরাট ছায়া দেখছেন না? ভালো ক'রে দেখুন, ছায়াটা এইদিকেই এগিয়ে আসছে!

অবনী ॥ (আবার দেখবার চেষ্টা ক'রে) হ্যাঁ,—আশ্চর্য্য রকম প্রকাণ্ড একটা ছায়া! প্রায় দোতালা বাড়ীর সমান উঁচু, আর চওড়াতেও বোধ হয় আট-দশ হাতের কম হবে না! কী ওটা?

হরিহর ॥ ভয়ঙ্কর !

অবনী ॥ সে আবার কি ?

হরিহর ॥ ঐ ছায়াটাই হচ্ছে শঙ্কর উপাধ্যায়ে ভয়ঙ্কর ! কিন্তু ওটা ছায়া নয়, রীতিমত কায়া ! ও আরো কাছে এগিয়ে এসেছে ! ওর মাটি কাঁপানো বিপুল পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তো ?

সুকোমল ॥ (সভয়ে) ও কেন এগিয়ে আসছে—ও কেন এদিকে এগিয়ে আসছে ?

হরিহর ॥ আপনারই জন্যে।

অবনী ॥ (টর্চ্চ জ্বেলে বিস্মিত কণ্ঠে) কই, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তো ?

হরিহর ॥ (মৃদু হাস্য ক'রে) আলো জ্বেলে আপনি কাকে দেখতে চান, ইন্‌স্পেক্টার মশাই ? অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে পড়লে আলো নিজেই ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু আলো জ্বেলে কেউ কি কখনো অন্ধকারকে খুঁজে পেয়েছে ? যে আসছে সে হচ্ছে অন্ধকারের সন্তান, নিরেট অন্ধকার দিয়ে ওর সর্ব্বশরীর গড়া ! আলো নেবালেই আবার ওকে দেখতে পাবেন।

অবনী ॥ (আলো নিবিয়ে) কিন্তু এই যে বললেন ওটা ছায়া নয়, কায়া ?

হরিহর ॥ হ্যাঁ, কায়া বটে, কিন্তু অন্ধকারেরই কায়া ! ওটা কায়া ব'লেই ওর ভয়াবহ পদশব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি।

অবনী ॥ (হতভম্বের মত) আপনার কোন কথার অর্থই আমি বুঝতে পারছি না, সবই যেন অসম্ভব আজগুবি কথা !

হরিহর ॥ এখন অর্থ বোঝবার চেষ্টা করবেন না, অর্থ বোঝাবার সময়ও আমার নেই। কিন্তু আবার চেয়ে দেখুন, রাস্তা থেকে কত উঁচুতে ও-দুটো কি দেখছেন ?

অবনী ॥ ক্রিকেট বলের মত বড় দুটো আগুনের গোলা ! ও দুটো আবার কি ?

হরিহর ॥ ঐ কৃষ্ণ অপচ্ছায়ার দুটো অগ্নিময় চক্ষু ! দেখছেন ঐ চোখ দুটো ? ওর ভীষণ আত্মার সমস্ত বীভৎসতা ফুটে উঠেছে ঐ-দুটো চক্ষুর ভিতর দিয়ে : পৃথিবীর যত পাপ আর হত্যা আর হিংসার ভাব যেন ঐ-দুটো চক্ষুর ভিতরেই গিয়ে বাসা বেঁধেছে ! দেখুন, দেখুন, ঐ ক্ষুধিত চোখ-দুটো তাকিয়ে আছে সুকোমল বাবুর দিকেই !

সুকোমল ॥ উঃ ! (কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়ল)

হরিহর ॥ ভয় নেই সুকোমল বাবু, ভয় নেই ! ঐ অন্ধকারের জীবদের সমস্ত রহস্যই আছে আমার নখদর্পণে, আমি যতক্ষণ এখানে আছি আপনাদের কারুর কোনই ভয় নেই।

শঙ্কর ॥ (দৃষ্টির অন্তরালে থেকে প্রচণ্ড স্বরে অট্টহাস্য ক'রে) ভয় নেই ? ভয়ঙ্কর যখন মূর্ত্তি ধারণ করেছে, তখন কে বলে ভয় নেই ? ... ... ওরে ভয়ঙ্কর ! ওরে বিশ্বগ্রাসী মৃত্যুর শরীরী প্রকাশ ! ওরে চির-অতৃপ্ত ক্ষুধার নিজস্ব মূর্ত্তি ! জেগে ওঠ তুই, আরো ভালো ক'রে জেগে ওঠ্ ! পৃথিবীর বুক

খেঁপে মূর্ত্তিমান ঝড়ের মত ধেয়ে যা তুই এই অভিশপ্ত বাড়ীর দিকে, ধেয়ে যা! এক পদাঘাতে এখানকার যা-কিছু সব ক'রে দে চূর্ণবিচূর্ণ! আমি নিজে তোর মূর্ত্তিগঠন করেছি—আমি তোর পিতা, আমি তোর স্রষ্টা! সমস্ত বিলুপ্ত করে দিয়ে তোর ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্—এই হচ্ছে আমার আদেশ!

[অন্ধকারে শোনা গেল কেবল দ্রুতপদের প্রচণ্ড শব্দ এবং অন্ধকার-পরিপূর্ণ শূন্যের মধ্যে বৃহৎ-ছু'টো অগ্নিময় নেত্রের চারিদিকে দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল যেন কতকগুলো বিদ্যুৎ-শিখা! একমাত্র হরিহর ছাড়া আর সকলেই দারুণ আতঙ্কে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল! ... ... আচম্বিতে পদশব্দ হ'ল নীরব, নিবে গেল ছু'টো জ্বলন্ত চক্ষু!]

হরিহর॥ (সানন্দে) আমার মন্ত্রঃপূত রেখা সফল হয়েছে! আমার রেখা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে এই দীপ্ত চক্ষুর ছায়াময় বিভীষিকার মারাত্মক আক্রমণকে! অন্ধকারের অভিশপ্ত আত্মা আবার মিলিয়ে যাবার চেষ্টা করছে অন্ধকারের মধ্যে! কিন্তু মিলিয়ে যাবার আগে ওকে আমারই আদেশ পালন করতে হবে। ... . (চীৎকার ক'রে) ওরে নিষ্ঠুর হত্যার শরীরী কালিমা! ওরে চির-অতৃপ্ত হিংস্র ক্ষুধার মূর্ত্তি! বিলুপ্ত হবার আগে পরিতৃপ্ত কর্ তোর ঐ বীভৎস ক্ষুধাকে! ধেয়ে যা তোরে স্রষ্টার দিকে—যে আজ তোর ক্ষুধাকে জাগ্রত ক'রেও তৃপ্ত করতে পারলে না! তোর ক্ষুধাগ্নির ইন্ধন রূপে গ্রহণ কর্ সেই দুরাত্মাকেই!

আবার মাটি-কাঁপানো দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কিন্তু শব্দ এবারে এগিয়ে আসছে না, অন্যদিকে চ'লে যাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে দাউ-দাউ শিখা নাচিয়ে জেগে উঠল আবার ছ'টো প্রদীপ্ত ও ভয়াল চক্ষু!]

শঙ্কর॥ (দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গগনভেদী আর্তনাদ ক'রে) রক্ষা কর! ক্ষমা কর! মুক্তি দাও! ওরে, আমি তোর স্রষ্টা, ওরে, আমাকে হত্যা—(আর কিছু শোনা গেল না)

হরিহর॥ (প্রশান্ত কণ্ঠে) শান্তি, শান্তি, শান্তি! হত্যাকে যে মূর্তিদান করে, হত্যার পায়ে আত্মবলি দিতে হয় তাকেই! স্নকোমলবাবু, উঠে দাঁড়ান, আর আপনার কোন ভয় নেই। পৃথিবী থেকে একটা মহাপাপ বিদায় হয়েছে।

অবনী॥ বিহ্বলের মত) আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমি জেগে আছি, না দুঃস্বপ্নের জগতে বাস করছি?

হরিহর॥ বলতে পারি না। এই ছনিয়ায় স্বপ্নই হয় সত্য, কিংবা সত্য পরিণত হয় স্বপ্নে, এ কথা ঠিক ক'রে বলা বড় কঠিন। আজকে যা দেখলেন আর শুনলেন, আপনারা এখন তাই নিয়েই আলোচনা করুন, আমি এখন বিদায় হলুম। নমস্কার!

পাঁচ

[রাস্তা। অবনী, সুকোমল ও পরিমল এবং পাহারা-ওয়ালারা। সকলেরই হাতে জ্বলন্ত টর্চ্চ। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে তারা অগ্রসর হচ্ছে।]

সুকোমল ॥ যদিও এখন আর কোনদিকে কারুর সাড়া নেই, তবু এখনো আমার কেমন ভয় করছে !

অবনী ॥ পুলিশে চাকরী করি, আমার তো ভয় করলে চলবে না ! যারা ভয়াল, তাদের নিয়েই আমাদের কাজ।

পরিমল ॥ কিন্তু কি দেখতে আমরা এখানে এসেছি ?

অবনী ॥ জানি না। আজ যা স্বচক্ষে দেখেছি তাও সত্য সত্যই দেখেছি ব'লেও বিশ্বাস হচ্ছে না। জীবন্ত মৃতদেহ, ছায়াময় বিরাট কায়া—পদভারে মাটি কাঁপিয়ে চলা-ফেরা করে, মন্ত্রঃপূত রেখা টেনে তাকে আবার বাধা দেওয়া যায় ! আমরা যেন আরবা-রজনীর ভিতরে গিয়ে একটি রাত্রি যাপন করছি। এ-সব কথা যদি আমার 'রিপোর্টে' লিখি, তাহ'লে আমাদের বড়, মেজ, ছোটো সাহেব তো হেসেই খুন হবে। হয়তো বাধ্য হয়ে আমাকে পেন্সন্ পাবার আগেই কাজ থেকে অবসর নিতে হবে।

পরিমল ॥ তাহলে আপনার 'রিপোর্টে' এ-সব উল্লেখ না

করাই ভালো। আজকের রাতের কোন কথাই অন্য কারুকে বলবার দরকার নেই।

অবনী ॥ তাই বা কেমন ক'রে হয়? বিকট একটা আর্ত্তনাদ শুনেছি—ঠিক যেন মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ! খুব সম্ভব আজ এখানে একটা নরহত্যা হয়েছে। আমি তার তদন্ত করতে বাধ্য। কে মারলে কাকে? কেন মারলে? কেমন ক'রে মারলে? এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাকেই। আমাদের সঙ্গে হরিহরবাবুও থাকলে ভালো হ'তো কিন্তু ঘটনা স্থলে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার তিনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

পরিমল ॥ আশ্চর্য্য মানুষ! যেন ঈশ্বর-প্রেরিত! তিনি না থাকলে আমাদের অবস্থা কি যে হ'ত, কে জানে?

সুকোমল ॥ (সচমকে) খানিক দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে না?

অবনী ॥ হ্যাঁ, একটা মূর্ত্তি!

সুকোমল ॥ (সভয়ে) তবে কি –

অবনী ॥ লোকটা কে দেখতে হচ্ছে।

সুকোমল ॥ না, না, আর এগিয়ে যাবেন না!

অবনী ॥ কেন?

সুকোমল ॥ ও যদি শঙ্কর উপাধ্যায় হয়?

অবনী ॥ তাহলেও আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। (আরো খানিক অগ্রসর হয়ে) একি, হরিহরবাবু?

হরিহর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যে হরিহর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

অবনী ॥ আপনি এখনো এখানে ?

হরিহর ॥ (সহাস্যে) বোধহয় একই কারণে আমরা সকলেই এখানে এসেছি।

অবনী ॥ আমরা এসেছি, কে এখানে আর্ত্তনাদ করলে তাই জানবার জন্যে।

হরিহর ॥ আমারও ঠিক ঐ উদ্দেশ্য।

অবনী ॥ কিছু জানতে পেরেছেন ?

হরিহর ॥ পেরেছি।

অবনী ॥ কি জানতে পেরেছেন ?

হরিহর ॥ আরো খানিকটা এগিয়ে এলেই দেখবেন, এখানে দু'টো লাস্ প'ড়ে আছে।

(সকলে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে গেল)

সুকোমল ॥ (সবিস্ময়ে) অ্যা, এ যে শঙ্কর উপাধ্যায়ের দেহ ! উঃ, ওর মুখের কি ভয়ঙ্কর ভাব !

হরিহর ॥ তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না ?

সুকোমল ॥ কি ?

হরিহর ॥ (গম্ভীর স্বরে) আমি ওর দেহটা ভালো করেই পরীক্ষা করেছি। ও কেমন ক'রে মরেছে জানি না, কারণ দেহের কোথাও কোন আঘাতের এতটুকু চিহ্ন নেই। কিন্তু ওর দেহের ভিতরে এতটুকু রক্তও নেই, পরীক্ষা করলে

আপনারাও তা জানতে পারবেন। কে যেন কোন্ রহস্যজনক উপায়ে ওর দেহ থেকে সমস্ত রক্ত একেবারে শোষণ ক'রে নিয়েছে !

অবনী ॥ এমন কথাও এই প্রথম শুনলুম।

হরিহর ॥ তারপর ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন।

অবনী ॥ আর একটা লাস্ !

হরিহর ॥ ও হচ্ছে সেই মূর্তি—মৃত্যুর পরেও যে জীবন্ত দেহ নিয়ে পৃথিবীর উপরে বিচরণ করত !

অবনী ॥ মড়ার মৃত্যু !

হরিহর ॥ অবনীবাবু, ও আগেও ছিল মড়া, এখনো আছে মড়া ! ওরও দেহ পরীক্ষা করলে বুঝবেন, ওটা তাজা নয়, অনেক দিন আগেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

সুকোমল ॥ কিন্তু ওর মধ্যেও যে জীবনী-শক্তি ছিল, সেটাও আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখেছি।

হরিহর ॥ (মাথা নেড়ে) সে জীবনী-শক্তি ওর নিজের নয়।

সুকোমল ॥ তবে ?

হরিহর ॥ শঙ্কর উপাধ্যায় মন্ত্রগুণে এই মৃতদেহের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল নিজের জীবনী-শক্তির অংশ। মড়ার উপরে এখানে কেউ খাঁড়ার ঘা মারেনি; শঙ্করের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই মৃতদেহের ভিতর থেকে তার জীবনী-শক্তি অদৃশ্য হয়েছে।

অবনী ॥ আর সেই ভয়ঙ্করের বিরাট ছায়া-দেহটা ?

হরিহর ॥ (হাত তুলে চারিদিকের অন্ধকারকে দেখিয়ে) নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে বাস করে যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত ভয়ঙ্কর। মহাপাপী শঙ্করের অপবিত্র কল্পনা অন্ধকারের ভিতর থেকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছিল যে নৃশংস অমঙ্গলকে, স্রষ্টাকে হত্যা ক'রেও সে কি আর নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে? স্রষ্টার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানসপুত্রেরও মৃত্যু হয়েছে। অন্ধকারের আত্মজ আবার প্রবেশ করেছে অন্ধকারের অন্তঃপুরে !

শেষ